স্বস্তির বাতিঘর

মাসুদা সুলতানা রুমী

স্বস্তির বাতিঘর

মাসুদা সুলতানা রুমী

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন ❐ বাংলাবাজার ❐ মগবাজার

www.amarboi.org

স্বস্তির বাতিঘর
মাসুদা সুলতানা রুমী

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশক
মাওলা প্রকাশনী
বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন : ৮৩৫৩১২৭

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন, বাংলাবাজার, মগবাজার

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে ২০১১
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ২০১৪
বৈশাখ ১৪২১
রজব ১৪৩৫

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দিন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আহসান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৭২৬৮৬৮২০২

বিনিময় মূল্য : ছত্রিশ টাকা মাত্র।

www.amarboi.org

লেখিকার কথা

রাসূল (সা.)-কে নিয়ে লেখার মতো যোগ্যতা, দক্ষতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কোনোটাই আমার নেই। আমার প্রিয়তম নবীজীকে নিয়ে লেখার এক অদম্য বাসনা আমার হৃদয় আর মস্তিষ্কে। তাঁকে নিয়ে যারা লিখেছেন, তাদের মিছিল অনেক বড়...। তারাও অনেক বড় মাপের মানুষ, বড় মানের লেখক। তারপরও প্রিয়তম রাসূল (সা.)-কে নিয়ে লিখে ইতিহাসের পাতায় অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। জানি, তাদের মতো পারব না, তবুও–

'আমার হৃদয় কাননে ফুল হয়ে ফুটেছে এক আশা

হে প্রিয়তম রাসূল, তোমায় নিয়ে লিখব

যতই আমি অজ্ঞ হই–

যতই দুর্বল হোক ভাষা।

তোমার নামে কাশিদা লিখে

যারা জীবনে মরণে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

তাদের সাথে আমার নামটিও থাকুক,

অবুঝ হৃদয় আমার এই প্রশান্তিটুকু যাচে।'

সম্মানিত পাঠক, ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে পরামর্শ দেবেন।

দয়াময় মহান রবের নিকট চাই– প্রিয়তম নবীজীর শাফাআত। দুনিয়ার শান্তি আর আখিরাতের নাজাত। আমীন, ছুম্মা আমীন।

মাসুদা সুলতানা রুমী

মে ২০১১

www.amarboi.org

সূচিপত্র

১. বিশ্বনেতা মুহাম্মদ (সা.) ॥ ৫

আল্লাহর সান্নিধ্যে ধন্য হলেন বিশ্বনবী ॥ ১৩

মিরাজের পটভূমি ॥ ১৩

মিরাজের উদ্দেশ্য ॥ ১৪

ঊর্ধ্বজগৎ থেকে প্রত্যাবর্তন ॥ ১৫

হিজরত ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ॥ ১৬

মিরাজের প্রাপ্তি ॥ ১৬

মিরাজের শিক্ষা ॥ ১৬

মুহাম্মাদ (সা.) মানুষ ছিলেন ॥ ১৯

রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব ও সৌন্দর্য ॥ ২২

শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) ॥ ২৬

তাঁর আগমনের পূর্ব অবস্থা ॥ ২৬

খতমে নবুওয়াতের প্রমাণ ॥ ২৮

'বিশ্বনবীর মোজেযা' ॥ ৩০

শিশুদের প্রতি রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা ॥ ৪২

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

স্বস্তির বাতিঘর

'বল, আমার সালাত, আমার কুরবানী (সর্বপ্রকার ইবাদাত) আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবকিছু সারা জাহানের রব আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে এবং সর্বপ্রথম আনুগত্যের মাথা অবনতকারী আমি নিজে।' (সূরা আন'আম : ১৬২-১৬৩)

১. বিশ্বনেতা মুহাম্মদ (সা.)

রবিউল আউয়াল মাস, এই মাসের ১২ তারিখ মতান্তরে ৯ তারিখে সোমবার। 'বিশ্বনেতা' মুহাম্মাদ (সা.)-এর শুভাগমন। কাউকে বিশ্বনেতা বললেই তিনি বিশ্বনেতা হয়ে যান না। তার মধ্যে বিশ্বনেতা হওয়ার গুণাবলি আছে কি না তার অনুসন্ধান প্রয়োজন।

বিশ্বনেতা অর্থ: সরল বাংলায় এর অর্থ দুনিয়ার সরদার।

হিন্দী ভাষায়: জগৎ গুরু। ইংরেজীতে : Leder of the world

হয়রত মুহাম্মদ সম্পর্কে এই উপাধি একেবারে বাস্তব সত্য। এতটুকু অতিরঞ্জিত করা হয়নি। বিশ্বনেতার মধ্যে চারটি শর্ত থাকতে হবে।

১. তিনি কোনো বিশেষ জাতি, বর্ণ বা শ্রেণীর কল্যাণের জন্য কাজ করবেন না; বরং সারা দুনিয়ার জন্য কাজ করবেন।

২. তাঁর দেওয়া আদর্শ ও মূলনীতিসমূহ যেন সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক হয় এবং মানব জীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান যেন এর মধ্যে থাকে।

৩. তাঁর পথনির্দেশনা যেন কোনো বিশেষ সময় বা কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থাকে। সকল অবস্থায় সকল যুগে তার উপযোগিতা ও সার্থকতা যেন একই রকম থাকে।

৪. তিনি যেন নিজের দেওয়া আদর্শকে বাস্তব জীবনে কার্যকর করে দেখিয়ে দেন। এখন দেখা যাক, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যে যাকে আমরা বিশ্বনেতা বলে দাবি করি তার মধ্যে এই চারটি শর্ত কী পরিমাণ আছে?

www.amarboi.org

প্রথম শর্ত: তিনি কোনো বিশেষ জাতি, বর্ণ বা শ্রেণীর কল্যাণের জন্য নয়; বরং সারা দুনিয়ার কল্যাণের জন্য কাজ করবেন।

নেতা মানে দিশারী বা পথ প্রদর্শক। তাঁর জীবনী পড়লে স্বল্প শিক্ষিত একটি বালক পর্যন্ত বুঝতে পারবে তিনি জাতি, বর্ণ বা শ্রেণী গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁর উদাত্ত আহ্বান বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য। প্রতিটি ইতর প্রাণীর স্বার্থ রক্ষার প্রতিও তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

তাঁর কাছে সাদা-কালো, ধনী-গরিব, বাদশা-ফকির, আর্য-অনার্য, আরব-অনারব, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য কোনো ভেদাভেদ ছিল না। তাঁর শিক্ষা তাঁর কল্যাণ কামনা ছিল বিশ্বজনীন। তাই তো তাঁর জীবিত কালেই তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে দেখতে পাই আরবী, হাবশী, রোমক, ইরানি, মিশরি ও ইসরাইলিদের সহাবস্থান।

আল কুরআনে উল্লেখিত নবীদের দেখতে পাই বিভিন্ন জাতির সংশোধনের জন্য তারা কাজ করেছেন। যেমন– মূসা (আ.) বনী ইসরাইল জাতির নবী। তেমনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক নবীই যার যার জাতির জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। শুধু বিশ্বনবী (সা.) এসেছেন বিশ্ববাসীর জন্য। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলেন,

'বড়ই বরকতসম্পন্ন তিনি, যিনি সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (কুরআন) তাঁর বান্দার উপর নাযিল করেছেন, যাতে সে বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হয়।' (সূরা ফুরকান : ১)

অর্থাৎ, একটি দেশের জন্য কিংবা কোনো জাতির জন্য নয়; বরং সারা দুনিয়ার জন্য এবং কেবল নিজের যুগের জন্য নয়; বরং ভবিষ্যতের সকল যুগের জন্য। এ বিষয়টি কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে :

'হে মানুষেরা! আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত।' (সূরা আরাফ : ১৫৮)

'আমার কাছে এ কুরআন পাঠানো হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদের এবং যাদের কাছে এটা পৌঁছে যায় তাদের সতর্ক করে দেই।' (সূরা আন'আম : ৯)

'আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি।' (সূরা সাবা : ২৮)

'আর আমি তোমাকে সারা দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছি।' (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'আমাকে সাদা-কালো সবার জন্য পাঠানো হয়েছে।'

'জাবের (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, সমস্ত নবীগণ নিজ

www.amarboi.org

নিজ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষভাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি সর্বসাধারণের (বিশ্বের) জন্য প্রেরিত হয়েছি।' (বুখারী, মুসলিম)

দ্বিতীয় শর্ত: 'তাঁর দেওয়া আদর্শ ও মূলনীতিসমূহ যেন সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক হয় এবং তাঁর আদর্শ ও মূলনীতির মধ্যে মানব জীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান যেন থাকে।'

এ শর্তটি তিনি পূরণ করেছেন সঠিকভাবে। তাঁর মূলনীতি ছিল সারাজাহানের স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য। এ আনুগত্যের অভাবই বিশ্ববাসীর মূল সমস্যা। এই মূল সমস্যার সমাধান হলে খুঁটিনাটি সব সমস্যার সমাধান আপনা আপনি হয়ে যায়। স্রষ্টার অবাধ্য হওয়ার পর মানুষের সামনে দুইটি পথ খোলা থাকে :

১. হয় সে নিজেকে স্বেচ্ছাচারী দায়িত্বহীন মনে করে, যা ইচ্ছা তাই করতে থাকে। না হয়–

২. সে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো শক্তির আনুগত্য করে নিজেকে নিকৃষ্ট পর্যায়ে নিয়ে যায়।

বাস্তবিক এই বিশ্বজগৎ আল্লাহর তৈরি। এখানে আইন চলবে, বিধান চলবে একমাত্র মহান আল্লাহর। মানুষ যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁরই জানার কথা কিসে মানুষের কল্যাণ। অতএব তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের মাঝেই রয়েছে প্রকৃত কল্যাণ। এই মহা সত্যটি বুঝতে না পারাই বিশ্ববাসীর মূল সমস্যা।

তাই রাসূল (সা.)-এর মিশনের প্রথম পদক্ষেপই ছিল আল্লাহর আনুগত্যের উপর দাওয়াত। যে সাক্ষ্য বাণী উচ্চারণ করে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে হয় সেই অঙ্গিকার বাণী হলো, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।'

এ কথাটি তিনি সকল মানুষের মনমস্তিষ্কে গেঁথে দিতে চেয়েছেন।

কাফির সর্দারেরা রাসূল (সা.)-কে এই দাওয়াত থেকে বিরত রাখার জন্য তাঁর কাছে লোভনীয় কিছু প্রস্তাব করেছেন। সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেছেন, 'তোমরা আমার এক হাতে চাঁদ এবং অন্য হাতে সূর্যও যদি এনে দাও তবুও আমার এই দাওয়াত থেকে আমি বিরত হব না।' আর সে দাওয়াত হলো, আল্লাহর তাওহীদের দাওয়াত, আনুগত্যের দাওয়াত। মহান আল্লাহ বলেন,

'বল আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি অপর কাউকে নিজের ওলী (পৃষ্ঠপোষক) বানিয়ে নেব কি? যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি রুজি দান করেন। রুজি গ্রহণ করেন না। বল, আমাকে তো সেই আদেশই করা হয়েছে যে, সকলের আগে

www.amarboi.org

আমি তাঁর সামনে মাতা নত করে দেব। আমাকে তাকিদ করা হয়েছে যে, তুমি কিছুতেই মুশরিকদের মধ্যে শামিল হবে না।' (সূরা আনআম : ১৪)

অন্যত্র বলেছেন,

'বল, আমার নামায, আমার কুরবানী (সর্বপ্রকার ইবাদাত) আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবকিছুই সারা জাহানের রব আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে এবং সর্বপ্রথম আনুগত্যের মাথা অবনতকারী আমি নিজে।' (সূরা আনআম : ১৬২-১৬৩)

বিশ্ববাসীর কাছে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের দাওয়াতই তিনি পেশ করেছেন। কারণ, আল্লাহর প্রতি আনুগত্যই পারে মানুষকে সর্বপ্রকারের খারাবি (মন্দ) থেকে রক্ষা করে একটি আদর্শ পূত-পবিত্র জাতিতে রূপান্তরিত করতে। সেই কাজটি রাসূলুল্লাহ (সা.) পরিপূর্ণভাবেই করেছেন।'

এ শর্তও তাঁর আদর্শের মধ্যে পুরাপুরি উত্তীর্ণ। তাঁর শিক্ষার উপযোগিতা দেড় হাজার বছর আগে যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে। দশ হাজার বছর পরও তেমনি থাকবে। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এর উপযোগিতা এতটুকু কম হবে না।

মানুষের ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, লেনদেন, ব্যবহার, আচরণ বিধি থেকে শুরু করে পরিবার, পরিবেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি জীবনের এমন কোনো দিক নেই যে দিকে রাসূল (সা.)-এর সার্বিক দিকনির্দেশনা নেই। দেড় হাজার বছর আগে তাঁর কথা ও উপদেশের অর্ন্তনিহিত অর্থ হয়ত সবাই বুঝত না কিন্তু আজ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাঁর সেসব কথার যর্থাথতা খুঁজে বের করেছে। যেমন– স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সারকথা তিনি (সা.) অতি সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের মাঝেই পরিষ্কার করেছেন:

মিসওয়াক করা: রাসূল (সা.) তাঁর উম্মতদের দিনে রাতে পাঁচ বার দাঁত মাজার কথা বলেছেন। ঘুমের আগে ঘুমের পরে দাঁত মাজার জন্য তো নির্দেশই দিয়েছেন। দাঁত মাজার গুরুত্ব তখন দুনিয়াবাসী জানত না। পাশ্চাত্যবাসীরা তো দাঁত মাজতে শুরু করেছে আরো অনেক পরে।

খাদ্যভ্যাস: 'তোমরা পেটের তিন ভাগের এক ভাগ খাদ্য, এক ভাগ পানি এবং এক ভাগ বাতাসের জন্য ফাঁকা রাখবে।' মানুষের দেহে যত প্রকারের রোগ হতে পারে এবং হয় তা সব অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের জন্য। তিনি নিয়মিত গোসল করতে, নিজেকে যথা সম্ভব সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে, সুগন্ধি ব্যবহার করতে, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

www.amarboi.org

পরিবেশ সচেতন: তিনি শুধু মানুষের নবীই ছিলেন না। পশু-পাখি ও গাছের প্রতিও তার স্নেহদৃষ্টি ছিল।

তিনি বলেছেন, 'পশুদের অভুক্ত রেখ না। অভুক্ত উটকে বেঁধে রাখার কারণে এক ব্যক্তিকে তিনি তিরস্কার করেন। আর এক ব্যক্তি একটি খাদ্যবিহীন ঝুড়ি দেখিয়ে একটি উটকে কাছে এনে ধরে বেঁধে রাখে। রাসূল (সা.) তাকে প্রতারক বলেন।'

কুকুর-বেড়ালের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখতে বলেন। তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি কুকুরকে পানি পান করানোর জন্য গুনাহমুক্ত হয়ে গেছেন এবং অপর ব্যক্তি বিড়াল বেঁধে রেখে মেরে ফেলার কারণে জাহান্নামি হয়েছে।' তিনি বলেছেন, 'তোমরা গাছ লাগাও। গাছ লাগানো সদকায়ে জারিয়াহ্। গাছের পাতা জিকির করে, গাছের ফল পশু-পাখি কিংবা অপর মানুষ যেই খাক না কেন তোমার আমলনামায় সওয়াব লেখা হবে। তুমি যদি জানতে পার আগামী কাল কিয়ামত সংঘটিত হবে, তবে আজো একটি গাছ লাগাও।'

আজকের পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এসব কথাই বলছে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য।

আমাদের সমাজে কত অন্যায়-অবিচার, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ আর অশান্তি বিরাজ করছে। তার কিছুই থাকতো না যদি আমরা পরিবার, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর দিক-নির্দেশনা মেনে চলতে পারতাম।

রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়।' কথাটা তিনি তিন বার বললেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি?' তিনি (সা.) বললেন, 'যার প্রতিবেশী তার কষ্টদায়ক আচরণ থেকে নিরাপদ নয়।' (বুখারী)

চতুর্থ শর্ত: 'তিনি যেন নিজের দেওয়া আদর্শকে বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দেন।'

এই শর্তটিও তিনি পূরণ করেছেন যথাযথভাবে। এমন কোনো বিষয় নেই যা তিনি বলেছেন, কিন্তু নিজে করেননি। তাই তো, রাসূল (সা.)-এর চরিত্র কেমন ছিল? জনৈক সাহাবীর এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'তুমি কি কুরআন পড়নি? কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র।'

আল্লাহর অনুগত্য করতে তিনি মানুষকে যতখানি বলেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি নিজে আনুগত্য করেছেন। এই সুমহান অবদানের জন্যই তিনি বিশ্বনেতা সারা জাহানের সরদার।

www.amarboi.org

নমুনা হিসেবে তার শিক্ষা থেকে কয়েকটি বাণী তুলে ধরছি। যার মধ্যে বিশ্বনেতা হওয়ার চারটি শর্তই বিরাজমান।

১. 'শরীর ও পোশাকের পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।'

২. 'যার মধ্যে আমানতকারী নেই বিশ্বস্ততা নেই, তার ঈমান নেই, এবং যে ব্যক্তি ওয়াদা ঠিক রাখে না তার দীন নেই।'

৩. ঈমানের অনেক শাখা রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। এ হলো মূল। আর শেষ শাখা হলো, পথ থেকে একটি কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা।

৪. 'যখন ভালো কাজে তোমার আনন্দ হবে এবং মন্দ কাজে অনুশোচনা হবে তখন (বুঝবে যে) তুমি ঈমানদার।'

৫. 'মুমিনদের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ঈমান হলো সেই ব্যক্তির যার স্বভাব-চরিত্র সবচেয়ে ভালো এবং যে আপন পরিবার-পরিজনের সাথে সবচেয়ে বেশি সদাচরণ করে।'

৬. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে তার উচিত অতিথিদের যত্ন করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া।'

৭. মুমিন কখনো অপবাদ ও অভিসম্পাতকারী অশ্লীল ও কটুভাষী হয় না।

৮. মুমিন আর সবকিছুই হতে পারে, আত্মসাৎকারী ও মিথ্যাবাদী হতে পারে না।

৯. প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে যে নিজে পেট পুরে খায় সে মুমিন নয়।

১০. ক্রোধ চরিতার্থ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা সংযত করে, আল্লাহ তার মনকে ঈমান ও নিশ্চিয়তায় পরিপূর্ণ করে দেন।

১১. চারটি দোষ যার মধ্যে আছে সে পুরাপুরি মুনাফিক:

ক. আমানত খেয়ানত করে, খ. কথা বললে মিথ্যা বলে,

গ. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, ঘ. এবং ঝগড়া করলে সীমালঙ্ঘন করে।

১২. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অনেক বড় গুনাহ।

১৩. 'ধোকাবাজ, কৃপণ ও দান করে যে বলে বেড়ায় এ ধরনের লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে না।'

১৪. 'যে ব্যক্তি দোষযুক্ত জিনিস বিক্রি করে এবং খরিদদারকে তার দোষের কথা জানিয়ে দেয় না তার উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট থাকেন, ফেরেশতারা অভিসম্পাত দিতে থাকে।'

১৫. 'পুরুষ কিংবা নারী যেই হোক না কেন জীবনের ষাট বছরও যদি আল্লাহর

www.amarboi.org

আনুগত্য করে কাটায় কিন্তু মৃত্যুর সময় কারো হক নষ্ট করে অসিয়ত করে। তাহলে তার জাহান্নামে যাওয়া অবধারিত।'

১৬. অধীনস্থদের সাথে খারাপ আচরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

১৭. যে ব্যবসায়ী দাম বাড়ানোর জন্য জিনিসপত্র আটকে রাখে সে অভিশপ্ত।

১৮. খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিন আটকে রাখার পর যদি কেউ তা দান করেও দেয় তবু আটকে রাখার গুনাহ মাফ হবে না।

১৯. সুদের মধ্যে পাপের সত্তরটা শাখা।

২০. যে বাড়িতে ইয়াতীমের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়, তা সর্বোত্তম বাড়ি। যে বাড়িতে ইয়াতীমের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয় তা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বাড়ি।

২১. যে ব্যক্তির মেয়ে সন্তান রয়েছে এবং তাকে জীবিত মাটিতে পুঁতে ফেলেনি। তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করে না বা তার উপর ছেলে সন্তানকে অগ্রাধিকার দেয়নি। তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

২২. অধীনরা তোমাদের ভাইবোন তুল্য। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ যার কর্তৃত্বে তার ভাইকে অর্পণ করেছেন, সে যেন নিজে যা খায়, তাকেও তাই খাওয়ায়। নিজে যা পরিধান করে, তাকেও তাই পরিধান করায় এবং সে কাজ তার ক্ষমতার বাইরে সে কাজ তাকে করতে বাধ্য না করে। আর যদি তার ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ তার উপর অর্পণ করে তাহলে সে যেন তাকে সে কাজে সাহায্য করে।

২৩. সত্যবাদিতা ও সততার সাথে লেনদেনকারী, আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে। (তিরমিযী)

২৪. আল্লাহ কিয়ামতের দুর্ভোগ থেকে মুক্ত করলে যার আনন্দ লাগে, সে যেন দরিদ্র ঋণগ্রস্ত পরিশোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দেয় বা তার উপর থেকে ঋণের বোঝা একেবারেই নামিয়ে দেয় অথবা ক্ষমা করে দেয়। (মুসলিম)

২৫. ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়ের ওপরই আল্লাহর লা'নত। (বুখারী ও মুসলিম)

২৬. হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ের দায়দায়িত্ব বহন করার সামর্থ্য আছে তার বিয়ে করা উচিত। কেননা, বিয়ে দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও লজ্জাস্থানের রক্ষণা-বেক্ষণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

২৭. 'সেই ব্যক্তি হতভাগ্য' কথাটি রাসূল (সা.) তিনবার বললেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল কোনো ব্যক্তি? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি তার মা-বাবাকে বা তাদের যেকোনো একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও (তাদের খিদমত করে না) সে

www.amarboi.org

জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না। (মুসলিম)

২৮. কোনো আত্মীয় সম্পর্ক রক্ষা করলে এর পরিবর্তে সম্প্রীতিপূর্ণ আচরণকারী প্রকৃত আত্মীয় সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়; বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারীই হচ্ছে প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষকারী। (বুখারী)

২৯. যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা করে না সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (আহমাদ ও তিরমিযী)

৩০. তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কারণ হিংসা পুণ্যগুলোকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে থাকে। (আবু দাউদ)

৩১. তোমরা শ্রমিককে তার শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ)

৩২. একজন লোক মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনলো তাই (যাচাই না করে) অন্য লোকের কাছে বলে বেড়ালো।

৩৩. গীবত ও পরনিন্দা ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য অপরাধ।

৩৪. কোনো ব্যক্তির নিজের দুই হাত দিয়ে কামাই করা বস্তু খাওয়ার চেয়ে উত্তম আর কোনো খাবার নেই। আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করতেন। (বুখারী)

৩৫. তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার মুচকি হাসিটিও সাদাকাহ। কোনো ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়া সাদাকাহ। কোনো মন্দ কাজ নিষেধ করা সাদাকাহ। পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখানো সাদাকাহ। ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করা সাদাকাহ। ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করা সাদাকাহ। পথ থেকে পাথর, কাঁটা ও হাড় সরানো সাদাকাহ। তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেওয়াটাও সাদাকাহ হবে। (তিরমিযী)

৩৬. পিতা সন্তানকে যাকিছু উপহার দেয় এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম উপহার হচ্ছে তাকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া।

৩৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন মেহমানের সমাদর করে। প্রথম এক রাত ও একদিন মেহমানকে সর্বোত্তম আপ্যায়ন দিন। মেহমানদারী তিন দিন পর্যন্ত। এরপর সে যা কিছু করবে তা তার জন্য সদকায় পরিণত হবে। আর মেহমানের জন্য গৃহকর্তার কাছে এত সুদীর্ঘ সময় অবস্থান করা উচিত নয়- যাতে সে বিব্রতবোধ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৮. 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ

www.amarboi.org

ছিলাম তুমি আমাকে দেখতে যাওনি। সে বলবে হে আমার প্রভু! আপনি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আপনাকে আমি কিভাবে দেখতে যাব? আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, কিন্তু তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে আমাকে তার নিকটেই পেতে। (বুখারী)

৩৯. 'মহান আল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'আমি আমার বান্দার সাথে তেমনি ব্যবহার করি, যেমন সে আমার সম্বন্ধে ধারণা রাখে।' (বুখারী)

৪০. আল্লাহ্ তাআলার কাছে অগ্রগণ্য সে ব্যক্তি যে প্রথমে সালাম দেয়। (আহমদ)

৪১. যখন মানুষ মারা যায় তখন মানুষের সব আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিন ধরনের আমলের সওয়াব সবসময় জারি থাকবে। ক. সাদাকায়ে জারিয়া, খ. এমন ইলম যার দ্বারা মানুষের উপকার সাধিত হয়। গ. সুসন্তান– যে তার জন্য দু'আ করে। (মুসলিম)

বিশ্বনেতা মুহাম্মাদ (সা.)-এর বহু বাণীর মধ্য থেকে কয়েকটি মাত্র পেশ করলাম। ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন এগুলো শুধু তাঁর মুখের কথাই ছিল না। এগুলো ছিল তাঁর বাস্তব জীবনে বাস্তবায়িত।

এ জন্যই তিনি বিশ্বনবী। বিশ্বনেতা। তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম।

অশান্তি আর অস্বস্তির পৃথিবীতে পথহারা মানুষের জন্য তিনি যেন 'স্বস্তির বাতিঘর।'

আল্লাহর সান্নিধ্যে ধন্য হলেন বিশ্বনবী

মিরাজের পটভূমি

নবুওয়াতের বারোটি বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর, ইসলামের দাওয়াত যখন পৌঁছে গেছে প্রতিটি ঘরে। তখন আরবে এমন কোনো গোত্র ছিল না, যে গোত্রের দুই চার জন এই দীনের ছায়াতলে আসেনি। আবর ভূমির প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তখন এই দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল। খোদ মক্কা নগরেই এমন একদল জীবনবাজি রাখা জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, যারা এই দীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য যে কোনো বিপদ-মুসিবতের ঝুঁকি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল।

কাফেরদের সীমাহীন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চল্লিশজন সাহাবী রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে হযরত জাফরের (রা.) নেতৃত্বে হাবশায় হিজরত করেন।

তিন তিনটি বছর 'শেবে আবী তালেবে' অবরুদ্ধ থাকার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস

www.amarboi.org

ছাড়তে না ছাড়তেই রাসূল (সা.)-এর বিপদের বন্ধু চাচা আবু তালেব ইন্তেকাল করেন। এই বিয়োগ ব্যথার মধ্যেই প্রধান পৃষ্ঠপোষক, জান ও মাল উৎসর্গকারী প্রাণপ্রিয় জীবন সাথী হযরত খাদিজা (রা.) ইন্তেকাল করেন। এই পর্যায়ে কাফেরদের অত্যাচার করার উৎসাহ এবং সাহস চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

ওদিকে ইয়াসরিবের আওস ও খাজরাজ গোত্রের মতো শক্তিমান গোত্রদ্বয়ের বিরাট সংখ্যক লোক ইসলামের মর্মবাণী বুঝতে পেরেছিল। 'রাত্রি যত গভীর হয় প্রভাত তত নিকটবর্তী হয়।' তখন ঠিক এমন একটি পরিস্থিতিই হয়েছিল। এ সময় রাসূল (সা.) তায়েফে যান। তাঁর মনে আশা ছিল, তায়েফের জনগণ তাকে বুঝতে পারবে, তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করবে। কিন্তু তায়েফবাসীগণ মক্কার জনগণের চেয়েও জঘন্যতম আচরণ করে রাসূল (সা.)-এর সাথে। তায়েফে রাসূল (সা.)-এর যে দুরাবস্থা হয়েছিল ইতিহাসের ভাষা তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিতে পারেনি। একবার হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে রাসূল (সা.)! আপনি কি ওহুদের চেয়েও কঠিন দিনের সম্মুখিন কখনো হয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, আয়েশা তোমার জাতি আমাকে যতই কষ্ট দিয়ে থাকুক আমার জন্য সবচেয়ে কষ্টকর দিন ছিল তায়েফে যে দিন আমি আব্দ ইয়ালিদের কাছে দাওয়াত দিলাম। সে তা প্রত্যাখ্যান করল আর আমাকে এত কষ্ট দিল যে, অতি কষ্টে কোনো রকম রক্ষা পেলাম।

এ পথে যারা চলেন, এ দায়িত্ব যারা পালন করেন, তাদের সাফল্যের সুসংবাদ কখন আসে সে কথা কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে:

'তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। অর্থ সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল এবং তাঁর সহচর মুমিনেরা বলে ওঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? জেনে রাখ, অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।' (সূরা বাকারা : ২১৪)

মিরাজের উদ্দেশ্য

তায়েফের অভিজ্ঞতার পর রাসূল (সা.)-এর জীবনের সর্বশেষ এবং সর্বকঠিন পরীক্ষা যেন শেষ হেলো। আল্লাহর বিধান অনুসারেই একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তখন অবধারিত হয়ে পড়েছিল। ইবাদতের একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা কাঠামোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এ সুসংবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই রাসূল (সা.)-কে মিরাজ দ্বারা সম্মানিত করা হয়। কুরআন মাজীদে সূরা বনী ইসরাইলে কেবল মসজিদে হারাম

www.amarboi.org

বা কাবাঘর থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নবী কারীম (সা.)-এর গমন করার উল্লেখ আছে। আর এই গমনের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে নিজের কিছু নিদর্শন দেখাতে চান। কুরআন কারীমে এর অধিক কোনো বর্ণনা দেওয়া হয়নি। অবশ্য হাদীসে এর ব্যাপক বর্ণনা এসেছে।

ঊর্ধ্বজগৎ থেকে প্রত্যাবর্তন

আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সা.) মিরাজ রজনীতে আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণ করেন। জান্নাত জাহান্নাম অবলোকন করেন। মানুষের সমাজ পরিচালনা ও ইবাদতের ব্যবহারিক জীবন আধ্যাত্মিক জীবনসহ রাষ্ট্র পরিচালনার দিক নির্দেশনা সাথে নিয়ে রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্বেই উম্মে হানীর কাছে সব বলেন। (তিনি রাতে চাচাত বোন উম্মে হানীর ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। এখান থেকেই জিবরাইল (আ.) তাকে তুলে নিয়ে যান। উম্মে হানী সব শুনে বলেন, আপনি কি এসব কথা সবার কাছে বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?' রাসূল (সা.) নিঃসংশয়ে বললেন, 'অবশ্যই আমি সবাইকে আমার রাতের সফরের কথা জানাব।' উম্মে হানী বাঁধা দিয়ে বললেন, আপনি এসব কথা কাউকে বলবেন না, তাহলে সবাই আপনাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে। রাসূল (সা.) উম্মে হানীর পরামর্শ উপেক্ষা করে কাবার চত্বরে আসতেই দেখা হয় আবু জাহেলের সাথে। আবু জাহেল রাসূল (সা.)-কে দেখেই বিদ্রূপের সুরে বলল, কী মুহাম্মাদ! কোনো নতুন খবর আছে নাকি?

রাসূল (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ আছে। আমি গত রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলাম।' বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে সপ্ত আসমান, জান্নাত, জাহান্নাম এবং আরশ মোয়াল্লা দেখে আমি রাতেই ফিরে এসেছি।

আবু জাহেল বলল, 'আমি লোকজন ডেকে আনি তুমি সবার সামনে এই কথা বলবে?' রাসূল (সা.) বললেন, অবশ্যই বলব।

আবু জাহেল নিজেই লোকজন ডেকে হাজির করল। তার ধারণা এসব উদ্ভট কথাবার্তা শুনলে জনগণ তাঁকে পাগল না হয় মিথ্যাবাদী বলে পরিত্যাগ করবে। কিন্তু আবু বকর (রা.) শুনেই বললেন, 'রাসূল (সা.) যখন বলছেন তখন আমি তা বিশ্বাস করি। তাঁর নিকট সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) আল্লাহর পয়গাম নিয়ে আসেন। আমি দ্বিধাহীন চিত্তে তা বিশ্বাস করেই তা মুসলিম হয়েছি। যে আরশের অধিপতি সকাল-সন্ধ্যা তাঁর কাছে ওহী পাঠান, ফেরেশতা পাঠান তিনি তাকে একবার তাঁর কাছে ডেকে নিয়েছেন। তাঁর নিদর্শনাদি দেখিয়েছেন এতে আশ্চর্যের কী আছে? আমি রাসূল (সা.)-এর সব কথা বিশ্বাস করি এবং তাকে সত্যবাদী বলে অকপটে স্বীকার করি।' এই সময়ই

www.amarboi.org

রাসূল (সা.) তাকে উপাধি দেন সিদ্দীকী। তার নাম হয় আবু বকর সিদ্দীকী। সিদ্দীকে আকবরী একদল দুর্বল ঈমানের মুসলমান সত্যি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়।

হিজরত ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

মিরাজের এক বছর পরেই কিংবা ঐ বছরই রাসূল (সা.) হিজরত করেন এবং মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম শুধুমাত্র কোনো অনুষ্ঠান কিংবা বিশ্বাস সর্বস্ব ধর্ম নয়। ইসলাম অতি বাস্তব দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রাপ্তির পথ। স্থান কালের সীমা উত্তীর্ণ একটি বিশ্বজনীন জীবন বিধান। এ শিক্ষা দেওয়া এবং আল্লাহর খিলাফত ও হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তব প্রশিক্ষণ দেওয়াই ছিল মিরাজের মূল উদ্দেশ্য।

মিরাজের প্রাপ্তি

মিরাজ রজনীর প্রথম ও প্রধানপ্রাপ্তি–

১. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত দানের ঘোষণা।

২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয এবং তার মাধ্যমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াবের ঘোষণা।

৩. সূরা বাকারার শেষের দুটি আয়াত।

৪. জান্নাত ও জাহান্নামের চাক্ষুস অভিজ্ঞতা।

৫. সর্বোপরি ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রূপরেখা।

মিরাজের শিক্ষা

আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা.)-কে পাঠিয়েছেন প্রচলিত সমস্ত জীবনব্যবস্থার উপর, বিকৃত মতবাদের উপর আল্লাহর মনোনীত ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আল্লাহ তাআলা আল কুরআনের তিনটি সূরায় তা ব্যক্ত করেছেন :

'তিনি আল্লাহ যিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন হেদায়াত ও সঠিক জীবনব্যবস্থা সহকারে। যাতে প্রচলিত সকল জীবনব্যবস্থার উপর একে বিজয়ী করা যায়।' (সূরা তাওবা, সূরা ফাত্হ ও সূরা সফ্)

তাই তাওহীদী জীবনব্যবস্থার ভিত্তিতে সঠিক কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের জন্য সঠিকভাবে কল্যাণকর একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সংস্কারমূলক পত্তন ও প্রবর্তন ছিল রাসূল (সা.)-এর মূল কাজ এবং এই কাজটি যাতে সুচারুভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেই লক্ষে আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় রাসূল (সা.)-কে মিরাজ রজনীতে প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন জ্ঞান দানের সাথে ১৪টি ধারা মূলনীতি তুলে দিলেন। এ মূলনীতি অনুযায়ীই তিনি পরবর্তীকালে বাস্তবায়ন

www.amarboi.org

করেন একটি মুসলিম সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা সূরা বনী ইসরাইলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই ১৪টি ধারা হচ্ছে, একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্রের কাঠামো। এই নীতিগুলোর ভিত্তিতে যদি কোনো সমাজ গড়ে উঠে তাহলে সে সমাজে অশান্তি প্রবেশের কোনো পথই থাকতে পারে না:

১. আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে মাবুদ বানিও না। যদি বানাও তবে তোমরা নিন্দিত, অপমানিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে।

২. তোমার প্রভুর সিদ্ধান্ত যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারো দাসত্ব ও উপাসনা করবে না। আর পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন অথবা দুজনই বৃদ্ধ অবস্থায় বেঁচে থাকেন। তবে তাদের সাথে 'ওই' শব্দটি পর্যন্ত করবে না। তাদের ধমক দিয়ে কথা বলবে না। নরম ভাষায় কথা বলবে। তাদের সামনে যাবে অত্যন্ত বিনম্র ও দয়ার্দ্রচিত্তে। আর বলবে, 'হে প্রভু তাদেরকে সেরূপ প্রতিপালন কর যে রূপে তারা আমাকে ছোট বেলায় লালন-পালন করেছিলেন।' তোমার প্রভু তোমার অন্তরের খবর রাখেন। তোমরা যদি সৎ হয়ে যাও তবে জেনে রেখ আল্লাহ প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

৩. আপন আত্মীয়-স্বজনের হক বুঝিয়ে দাও এবং মিসকিন ও পথিকদের হক বুঝিয়ে দাও। আর অন্যায়ভাবে অর্থ-ব্যয় করো না।

৪. যারা বেহুদা খরচ করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের অকৃতজ্ঞ।

৫. তুমি যদি এদের অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজন মিসকীন ও সম্বলহীনদের বিমুখ করতেই হয়, (এ কারণে যে) তাদের দেওয়ার মতো সম্পদ তোমার কাছে নেই এবং তুমি তোমার রবের কাছে অনুগ্রহ কামনা করছ, যা পাওয়ার তুমি আশাও রাখো– তাহলে একান্ত নম্রভাবে তাদের সাথে কথা বল।

৬. নিজের হাত গলার সাথে বেঁধে রেখ না কিংবা একেবারে খোলা ছেড়ে দিও না। তা করলে তোমরা তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে যাবে। তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন। তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সব জানেন এবং তাদের দেখছেন।

৭. নিজেদের সন্তানকে দারিদ্র্যতার আশঙ্কায় হত্যা করো না। আমি তাদেরকে রিযিক দেব এবং তোমাদেরকেও। বস্তুত তাদের হত্যা করা একটি বিরাট অপরাধ।

৮. যিনার নিকটেও যাবে না, এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং অতীব নিকৃষ্ট পথ।

৯. প্রাণ হত্যার অপরাধ করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু

www.amarboi.org

সত্যতাসহকারে আর যে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে তার অলিকে আমরা কেসাস দাবি করার অধিকার দিয়েছি। অতএব, সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে। তাকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে।

১০. ইয়াতীমের ধন-মালের কাছেও যাবে না। তবে অতি উত্তম পন্থায়। যতদিন না সে যৌবন লাভ করে।

১১. ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে যে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে তাতে সন্দেহ নেই।

১২. পাত্র দিয়ে মাপ দিলে পুরোপুরি ভর্তি করে দেবে আর ওজন করে দিলে ত্রুটিহীন পাল্লা দিয়ে ওজন করে দেবে। এটা খুবই ভালো নীতি এবং পরিণামের দৃষ্টিতেও অতীব উত্তম।

১৩. এমন কোনো জিনিসের পেছনে তোমরা লেগে যেও না, যে বিষয়ের কোনো জ্ঞানই তোমার নেই। নিশ্চিত জেনে নাও, চোখ, কান ও দিল সবকিছুকেই জবাবদিহি করতে হবে।

১৪. অহঙ্কার ভরে চলা ফেরা করো না। তোমরা না জমিনকে দীন করতে পারবে, না পর্বতের ন্যায় উচ্চতা লাভ করতে পারবে।

এই হলো মিরাজের শিক্ষা। এ শিক্ষাকে অবহেলা করে মেরাজের অন্যান্য মনগড়া অনুষ্ঠানাদি করা আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূল (সা.)-কে শুধু এই নিয়মনীতি দিয়েই ক্ষান্ত হননি। এই নিয়মনীতি অস্বীকারকারীর নির্মম পরিণতি আর মান্যকারীর অফুরান অপার্থিব সফলতা স্বচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। রাসূল (সা.) জান্নাত ও জাহান্নাম দেখলেন এবং কেন কি কারণে কোন্ কাজের বদলায় এ পরিণতি তাও জানলেন প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টি কোন থেকে।

জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে, দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি পেতে হলে মিরাজ রজনীর সঠিক গুরুত্ব ও মূল্য দিতে চাইলে মিরাজ রজনীতে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীকে যে শিক্ষা, যে দিন-নির্দেশনা যে তোহফা দিয়েছেন বিনা তর্কে নিঃশঙ্কচিত্তে سَمِعْنَا ও وَاَطَعْنَا – আমি শুনিছি এবং মেনে নিয়েছি বলে আনুগত্যের পূর্ণ শির নত করে দিতে হবে। এ রাত নফল ইবাদতের রাত নয়। এ দিনে রোযা রাখা এবং রাত জেগে নফল নামায পড়ার কোনো শিক্ষা কিংবা নিয়ম রাসূল (সা.) প্রবর্তন করেননি। আসল শিক্ষাকে দূরে নিক্ষেপ করে এ রাতে কতিপয় মনগড়া ইবাদাতে মশগুল থাকে মুসলিম জাতি। হাদীস-কুরআনে যে

www.amarboi.org

রাতের কোনো উল্লেখ করা হয়নি, সে রাতের ফজিলত বর্ণনা করা সওয়াবের কাজ নয়। রসম ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে মূল শিক্ষা থেকে দূরে থাকলে শরীআতের গৌরব বৃদ্ধি পায় না। সত্যিকার দীনদার হওয়া যায় না। এ রাত হবে প্রতিজ্ঞার রাত। ভুলে যাওয়া শিক্ষাকে ঝালাই করার রাত। এ রাতে বেশি করে কুরআন থেকে আলোচনা করা ও শোনা উচিত। বিশেষ করে সূরা বনী ইসরাইলের শিক্ষাগুলো যা এ রাতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন।

এ রাত মানবজাতির গৌরবের রাত।

এ রাত সকল মাখলুকের উপর মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের রাত।

এ রাত সকল নবীদের চেয়ে নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার রাত। আল্লাহর সান্নিধ্যে বিশ্বনবী ধন্য হলেন এ রাতে।

মুহাম্মাদ (সা.) মানুষ ছিলেন

প্রত্যেক যুগেই অজ্ঞ লোকেরা মনে করত, মানুষ কখনো নবী হতে পারে না। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ নবী হিসেবে পাঠাবেন, তাকে অবশ্যই মানব উর্ধ্ব কোনো সত্তা হতে হবে। অতিমানবিক গুণাবলি তার থাকতে হবে। তিনি ফুঁ দিয়ে পাহাড়কে সাগরে পরিণত করতে পারবেন, বালুকারাশিকে স্বর্ণে পরিণত করতে পারবেন। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব তার জানা থাকবে। মোট কথা, তাকে খোদায়ী গুণসম্পন্ন হতে হবে। তাই তো তারা আশ্চর্য হয়ে বলে, 'এ কেমন নবী, যিনি খানাপিনা করেন, স্ত্রী ও সন্তানাদি নিয়ে ঘর-সংসার করেন এবং হাট-বাজারে যেখানে-সেখানে চলাফেরা করেন।'

নবীদের অস্বীকারকারীদের মধ্যে এটা ছিল মূল বিষয়। তাদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহর বাণী নিয়ে আসতে হলে এক ফেরেশতা আসবে। কিংবা এমন কোনো সত্তা আসবে, যে মানবিক গুণাবলির উর্ধ্বে। এ কেমন কথা, আল্লাহ একজন নবী পাঠালেন আর তাকে মানুষেরা ইট-পাটকেল মারল, উটের নাড়ি-ভুঁড়ি গায়ের উপর তুলে দিল, মিথ্যাবাদী, পাগল বলে গালি দিল, বন্দী করল, আহত করল। তারা বিশ্বাসই করতে পারল না, যার হাতে নেই কোনো অর্থ-সম্পদ, যার জীবিকা নির্বাহের একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই, সে কি না দাবি করে বিশ্বস্রষ্টার নবী হিসাবে।

কিন্তু সব কুশলীর বড় কুশলী মহাজ্ঞানী অসীম দয়ালু মহিমান্বিত আল্লাহ একজন মানুষকে নবুওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এ কাজের জন্য এক বা একাধিক ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন। এমনকি ছাপানো

www.amarboi.org

বইয়ের আকারেও কুরআন মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে দিতে পারতেন, কিন্তু হাতে হাতে পৌঁছে দিলে হবে না; সে জন্য প্রয়োজন ছিল একজন সুযোগ্য মানুষের। আল্লাহ তাআলা বলেন,

'আমি আপনার উপর এ কিতাব এ জন্য নাযিল করেছি, যাতে এরা যে মতভেদের মধ্যে পড়ে আছে এর আসল মর্ম তাদের কাছে আপনি প্রকাশ করেন। আর যারা এ কিতাবের উপর ঈমান এনেছে তাদের জন্য যেন হেদায়াত ও রহমত হয়।' (সূরা নাহল : ৬৪)

অর্থাৎ, বাণী বাহকের কাজ শুধু এটুকুই হবে না যে, তিনি বাণী সবাইকে শুনিয়ে দিলেন; বরং তাঁর কাজ হবে আল্লাহর এ বাণীর আলোকে তিনি নিজেকে, পরিবারকে, সমাজকে সংশোধন করবেন। যাতে তারা মনে কোনো সন্দেহ-সংশয় পোষণ না করে। যে ভালো বুঝতে না পারবে তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। যারা তার দাওয়াত শোনে, মানে তাদের নিয়ে একটি সুন্দর সাবলীল, সুশীল সমাজ গড়ে তুলতে হবে। আর যারা তাঁর দাওয়াত অমান্য করে, বিরোধিতা করে, তাদের সাথে তিনি এমন আচরণ করেন, যাতে তাদেরও পরবর্তীতে এ সমাজের এ দীনের অনুসারী হিসেবে পাওয়া যাবে।

এসব কাজের জন্য মানুষ ছাড়া আর কাকে পাঠানো যেতে পারে? মানুষের মধ্যে মানুষের মতো বাস করে মানুষের প্রতিটি খুঁটিনাটি দোষত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া, সংশোধন করা ফেরেশতার পক্ষে সম্ভব নয়; এ কাজের জন্য একজন মানুষই উপযুক্ত।

আদম (আ.) মানুষ ছিলেন : আল্লাহ বলেন, সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন–

'আমি মাটি দিয়ে একজন মানুষ তৈরি করার সিদ্ধান্ত করেছি।' (সূরা সোয়াদ : ৭১)

নূহ (আ.) মানুষ ছিলেন : 'নূহ (আ.) বললেন, আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার রয়েছে এবং আমি এও বলি না, আমি অদৃশ্য জগতের জ্ঞান রাখি। আমি এমন দাবিও করি না, আমি ফেরেশতা...।' (সূরা হূদ : ৩১)

মানুষ নবী হতে পারে না সকল পথভ্রষ্ট লোকদের– এ এক সাধারণ ধারণা।

এ জন্যই কুরআন বার বার জোর দিয়ে বলেছে, সকল নবীই মানুষ ছিলেন। মানুষের জন্য নবী মানুষই হওয়া উচিত।

নূহ (আ.) বললেন : 'তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদেরই স্বজাতির এক লোকের মাধ্যমে তোমাদের রবের স্মারক বাণী এল,

www.amarboi.org

যাতে তোমাদের সতর্ক করা যায়। তোমরা ভ্রান্ত পথ থেকে বেঁচে থাকতে এবং তোমরা অনুগৃহীত হতে পার।' (সূরা আ'রাফ : ৬৩)

'(হূদ) বললেন, হে আমার কাওম! আমি বোকামিতে পড়ে নেই; বরং আমি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে রাসূল। আমি তোমাদেরকে আমার রবের বাণী পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের এমন হিতকামী, যার উপর ভরসা করা যায়। তোমরা কি এ কারণে অবাক হচ্ছে যে, তোমাদের কাওমেরই এক লোকের মারফতে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সাবধান করে দেয়? একথা ভুলে যেও না যে, তোমাদের রব নূহের কাওমের পর তোমাদেরকে তাদের জায়গায় বসিয়েছেন এবং তোমাদের খুব শক্তিশালী করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর কুদরতের মহিমার কথা মনে রেখ। হয়তো তোমরা সফল হবে।' (সূরা আ'রাফ : ৬৭-৬৯)

সালেহ ও শো'আইব (আ) মানুষ ছিলেন : তারা (সামূদ জাতির লোকেরা) বলল,

'তারা জবাবে বলল, তুমি একজন জাদুগ্রস্ত লোক। তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কী? তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে কোনো নিদর্শন আন দেখি।' (সূরা শু'আরা : ১৫৩-১৫৪)

মূসা (আ.) ও হারুন (আ.) মানুষ ছিলেন : তারা (ফিরাউন ও তার পরিষদবর্গ) বলতে লাগল,

'আমাদেরই মতো দুজন মানুষের ওপর আমরা ঈমান আনব নাকি? আর তাও এমন দুজন লোক, যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস।' (সূরা মুমিনূন : ৪৭)

সকল নবীই মানুষ ছিলেন

'তাদের রাসূলগণ তাদের বলল, সত্যিই আমরা তোমাদের মতোই মানুষ ছাড়া আর কিছু নই। তবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগৃহীত করেন। (সূরা ইবরাহীম : ১১)

নবী মুহাম্মাদও (সা.) মানুষ ছিলেন

কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ চিরদিন মানুষকেই রাসূল করে পাঠিয়েছেন। কারণ ফেরেশতা মানুষের চেয়ে উচ্চতর কোনো সত্তা নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

'তাদেরকে বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের নিকট ফেরেশতাকেই রাসূল হিসেবে পাঠাতাম।' (সূরা বনী ইসরাইল : ৯৫)

www.amarboi.org

কুরআনে আরো অনেক আয়াত আছে, যা নবী-রাসূলদের অতিমানব বা ফেরেশতা নয়, মানুষ হওয়ার অকাট্য প্রমাণ।

রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আমি তোমাদের মতোই মানুষ; 'পার্থক্য এটুকু' আমার নিকট ওহী নাযিল হয়।'

মানুষের হেদায়াতের জন্য, মানুষের উৎকর্ষতার জন্য, মানুষের শিক্ষার জন্য, মানুষের মুক্তি জন্য, মানুষের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণের জন্য তো একজন মানুষই প্রয়োজন। আর তাই তো মডেল হিসেবে রাসূল (সা.)-কে দেখতে পাই আমরা জীবন্ত কুরআনরূপে। আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বর্ণনা মতে, জনৈক সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'তোমরা কুরআন পড়নি? কুরআনই রাসূল (সা.)-এর চরিত্র।'

কুরআন এবং হাদীস অধ্যয়নে জানতে পারি, তিনি ছিলেন মানুষের মাঝে সর্বোত্তম মানুষের মডেল বা আদর্শ। মানুষের জীবনের এমন কোনো দিক খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেদিকে তাঁর নির্দেশনা নেই। কীভাবে পানি খাবে? কীভাবে দাঁত মাজবে, কীভাবে জুতো পরবে, পোশাক পরবে, সুখের প্রকাশ, দুঃখের প্রকাশ, বিপদে-মসিবতে কী করবে, হাসি-আনন্দে, হাস্য-কৌতুকে, সভা-সমিতিতে কথোপকথনে, লেনদেনে, পরিবার-পরিজনের কার সাথে কেমন আচরণ করবে? দুর্জনের সাথে সুজনের সাথে কেমন হবে আচরণ? ব্যক্তির, সমাজের, রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান আছে তাঁর কাছে। অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, বন্দীনীতি, পররাষ্ট্র নীতি, সব দিকেই আছে তাঁর কাছে। অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, বন্দীনীতি, পররাষ্ট্র নীতি, সব দিকেই আছে তাঁর দিকনির্দেশনা। কারণ, তিনি যে মানুষের জন্য মানুষ নবী (সা.)।

রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব ও সৌন্দর্য

পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন অপরিসীম ব্যক্তিত্বের অধিকারী। নবী-রাসূলদের মধ্যে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কাফিররা তাঁর আনীত দীনের সাথে যত দুশমনিই করুক না কেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে ম্রিয়মান হয়ে যেত। উদাহরণস্বরূপ আবু জাহেলের নিম্নোক্ত ঘটনা পেশ করা যেতে পারে :

আবু জাহেলের কাছে দুই ইয়াতীম বালকের সম্পত্তি গচ্ছিত ছিল। সে কিছুতেই সম্পদ ফেরত দিচ্ছিল না। ইয়াতীম বালক দুটি বারবার আবেদন করেও কোনো ফল পাচ্ছিল না। তারা বিফল হয়ে অন্যান্য লোকের কাছে তাদের ফরিয়াদ জানাল। লোকগুলো তখন কাবা ঘরের চত্বরেই বসে ছিল। সেই লোকেরা

www.amarboi.org

তামাশা করে ইশারায় নবী করীম (সা.)-কে দেখিয়ে দিলে বলল, ওই লোকের কাছে তোমাদের সমস্যার কথা বল। সে তোমাদের সমাধান করে দিতে পারবে।

অসহায় ছেলে দুটি রাসূল (সা.)-এর কাছে তাদের সমস্যার কথা বলতেই তিনি তাদের সাথে নিয়ে আবু জাহেলের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আবু জাহেলের কাছে গেলে কী ঘটে তা দেখার জন্য কাফিররা দুজন লোক পাঠাল, দূর থেকে তামাশা দেখার জন্য।

রাসূল (সা.) আবু জাহেলের বাড়ি পৌঁছে তার দরজায় করাঘাত করেন। আবু জাহেল দরজা খুলে রাসূলকে দেখেই কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। রাসূল (সা.) বললেন, এই বালক দুটির যা পাওনা আছে মিটিয়ে দাও। আবু জাহেল কোনো প্রকার উচ্চবাক্য না করে বালকদ্বয়ের পাওনা মিটেয়ে দিল। দূর থেকে লোকেরা এ দৃশ্য দেখে দৌড়ে কাবার চত্বরে এসে বলতে লাগল, আবুল হাকাম মুসলমান হয়ে গেছে। সে মুহাম্মাদ (সা.)-এর দীন মেনে নিয়েছে।

সবাই আবু জাহেলকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি মুহাম্মাদ (সা.)-এর দীন গ্রহণ করেছ? আবু জাহেল বলল, না আমি তার দীন গ্রহণ করিনি, কিন্তু মুহাম্মাদ যখন আমার কাছে ইয়াতীম বালকদ্বয়ের সম্পদ ফেরত চাইল, তার দুপাশে দুটি সাপ হা করে ছিল। আমার আশঙ্কা হচ্ছিল আমি সম্পদ ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলেই সাপ দুটি আমাকে খেয়ে ফেলবে। কোনো কোনো ব্যাখ্যায় আবু জাহেলের এ বর্ণনার কারণ ছিল, রাসূল (সা.)-কে জাদুকর প্রতিপন্ন করা। আসলে আবু জাহেল রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিত্বের কাছে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সে ব্যক্তিত্ব আবু জাহেলকে এতই প্রভাবিত করেছিল যে, সে বিনা দ্বিধায় তাঁর নির্দেশ পালন করেছে।

মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় সাধারণত তার দৈহিক সৌন্দর্যের ওপর। মানুষের আপাদমস্তক দেহের গঠন দ্বারাও বোঝা যায়, সে মানসিক, নৈতিক ও চেতনাগত দিক দিয়ে কোন স্তরের মানুষ।

আমরা যারা রাসূল (সা.)-এর বহু পরে পৃথিবীতে এসেছি, তারা চর্মচক্ষু দিয়ে রাসূল (সা.)-কে দেখিনি। অপরদিকে তাঁর কোনো ছবি বা প্রতিকৃতিও নেই, স্বয়ং রাসূল (সা.)-ই কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন ওসব বানাতে। কারণ, ছবি এমন বিপজ্জনক জিনিস, তার জন্য সহজেই শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে মানুষ। তাই রাসূল (সা.)-এর প্রিয় সাহাবীগণ মৌখিক বর্ণনায় তাঁর যে নিখুঁত ছবি এঁকে দিয়েছেন, সে ছবি অন্তর দিয়ে দেখেই আমরা ধন্য হব। নিম্নে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা তুলে ধরছি :

www.amarboi.org

১. একটি বাণিজ্যিক কাফেলা এসে মদীনার উপকণ্ঠে যাত্রাবিরতি করে। ঘটনাক্রমে রাসূল (সা.) সেদিকে গেলেন। তিনি একটি উট বাছাই করে দাম-দস্তুর ঠিক করেন। অতঃপর এই বলে নিয়ে গেলেন, দাম পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ সময় কাফেলা নেতার স্ত্রী বললেন, নিশ্চিন্তে থাক, আমি এ ব্যক্তির পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা দেখেছি। তিনি কখনো তোমার সাথে লেনদেনে অসততা দেখাতে পারেন না। এ ধরনের মানুষ যদি উটের মূল্য না দেয়, তবে আমি নিজের কাছ থেকে দিয়ে দেব।

অপরিচিত এ মহিলা তাঁর চেহারা এবং ব্যক্তিত্ব দেখেই এমন উক্তি করেছিলেন। কিছুক্ষণ পর নবী করীম (সা.) নির্ধারিত মূল্যের চেয়েও বেশি খেজুর পাঠিয়ে দেন। (আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া)

২. আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, 'রাসূল (সা.)-এর চেয়ে সুন্দর, সুদর্শন আমি কাউকে দেখিনি। মনে হতো, যেন সূর্য ঝিকমিক করছে।

৩. রবী বিনতে মুরাওয়া বলেন, 'তুমি যদি রাসূল (সা.)-কে দেখতে তবে মনে হতো যেন সূর্য উঠছে।

৪. হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.)-কে যে দেখত, সে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রভাবিত হয়ে যেত।'

৫. হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বলেন,'আমি একবার জোসনা রাতে রাসূল (সা.)-কে দেখেছিলাম, তিনি তখন লাল পোশাক পরে ছিলেন। আমি একবার চাঁদের দিকে একবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম। অবশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, রাসূল (সা.) চাঁদের চেয়েও সুন্দর।

৬. হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) বলেন, 'আনন্দের সময় রাসূল (সা.)-এর চেহারা চাঁদের মতো ঝকঝক করত। এটা দেখেই আমরা তাঁর আনন্দ টের পেতাম।'

৭. হিন্দ্ ইবনে আবী হালা (রা.) বলেন, 'তাঁর চেহারায় চাঁদের মতো চমক ছিল।'

৮. তিনি আরো বলেন, 'প্রশস্ত কপাল, বাঁকানো চিকন ও ঘন ভ্রূ, উভয় ভ্রূ আলাদা, উভয় ভ্রূ'র মাঝখানে একটি রগ ছিল। রাগান্বিত অবস্থায় এ রগ স্পষ্ট হয়ে যেত।'

৯. হযরত আনাস (রা.) বলেন, 'তাঁর বর্ণ চুনের মতো সাদাও নয়, শ্যাম বর্ণেরও নয়; গমের মতো রং তবে একটু সাদাটে।

১০. হযরত আলী (রা.) বলেন, 'গায়ের রং লালচে সাদা কালো চোখ, লম্বা পলক, শরীর মোটা ছিল না, দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানটি মাংসল।'

www.amarboi.org

১১. হিন্দ বিন আলী হালা বলেন, 'তাঁর বর্ণ ছিল সাদা দীপ্ত, চোখের মণি দুটি কালো, দৃষ্টি আনত। চোখের কিনারা দিয়ে দেখার সলজ্জপ্রবণতা, নাক খানিকটা উঁচুও তার ওপর জ্যোতির্ময় চমক। এ জন্য প্রথম দৃষ্টিতে বড় মতো হতো। গাল হালকা ও সমতল। নিচের দিকে একটু মাংসল। মুখ প্রশস্ত। মুখভরা ঘন দাড়ি। ঘাড়ের রং চাঁদের মতো উজ্জ্বল ও মনোরম। মাথা বড় তবে সুসম মধ্যমাকৃতির। চুল মাঝখান দিয়ে সিঁথিকাটা। শরীরে বেশি লোম ছিল না। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত লোমের চিকন রেখা। ঘাড়, বাহু ও বুকের ওপরের অংশের সামান্য কিছু লোম। শরীরটা ছিল মযবুত গড়নের। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়ার হাড় বড় ও শক্ত। বুক ও পেট সমতল। দুই কাঁধের মধ্যবর্তী অংশ সাধারণ মাপের চেয়ে বেশি। বাহু লম্বা। হাতের তালু প্রশস্ত। আঙুলগুলো মানানসই লম্বা। হাতের পাতা ও পায়ের পাতা মাংসল ছিল। পায়ের পাতা কিঞ্চিৎ গভীর। পায়ের পিঠ এত মসৃণ যে, তাতে পানিই দাঁড়ায় না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্বত গুহা থেকে যখন মদীনায় হিজরতের জন্য রওয়ানা দেন, সেদিন পথিমধ্যে উম্মে মা'বুদ নামে এক মহীয়সী বৃদ্ধার বাড়িতে বিশ্রাম নেন। রাসূল (সা.) ও তাঁর সঙ্গীরা নিদারুণ তৃষ্ণাকাতার ছিলেন। উম্মে মা'বাদের ক্ষুধার্ত জরাজীর্ণ বকরি থেকে সেদিন প্রচুর দুধ দোহন করা হয়। মেহমানদারি করার পরও বৃদ্ধার অনেক দুধ অবশিষ্ট থেকে যায়। তার স্বামী বাড়ি এসে দুধ দেখে জানতে চায়, দুধ কোথা এল। মহিলা ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করার পর তার স্বামী বলল, এ কুরাইশি লোকের আকৃতির বর্ণনা দাও তো। তখন উম্মে মা'বাদ চমৎকার ভাষায় রাসূল (সা.)-এর আকৃতির বিবরণ দেন।'

'পবিত্র ও প্রশস্ত মুখমণ্ডল প্রিয় স্বভাব। পেট উঁচু নয়, মাথায় টাক নেই। সুদর্শন, সুন্দর। কালো ও ডাগর চোখ। লম্বা ঘন চুল। গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। উঁচু নাক। সুরমাযুক্ত চোখ। চিকন ও জোড়া ভ্রূ। কালো কোঁকড়ানো চুল। নীরব গম্ভীরও আন্তরিক। দূর থেকে দেখলে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। নিকট থেকে দেখলে অত্যন্ত মিষ্ট ও সুন্দর। মিষ্টভাষী, স্বল্পভাষী। নিষ্প্রয়োজনীয় শব্দের ছড়াছড়ি থেকে মুক্ত কথাবার্তা। সমস্ত কথাবার্তা মুক্তার হারের মতো পরস্পরের সাথে যুক্ত। মধ্যম ধরনের লম্বা। ফলে কেউ তাঁকে ঘৃণাও করে না, তাচ্ছিল্যও করে না। সুদর্শন। সার্বক্ষণিক সহচরদের প্রিয়জন। যখন সে কিছু বলে, সবাই নীরবে তা শুনে। যখন সে কোনো নির্দেশ দেয় তৎক্ষণাৎ সবাই তা পালন করতে ছুটে যায়।

সকলের সেবা লাভকারী, সকলের আনুগত্য লাভকারী। প্রয়োজনের চেয়ে স্বল্পভাষীও নয়, অমিতভাষী নয়।

www.amarboi.org

দৈহিক সৌন্দর্যই নয়; তাঁর পোশাক, রুচি, খাদ্য কথাবার্তা, সাজসজ্জা, বক্তৃতা, ব্যক্তিগত জীবন, পানাহার, উঠাবসা, শয়ন-নিদ্রা, মেহমানদারী, মানবীয় প্রয়োজন, আবেগ-অনুভূতি, রসিকতা, বিনোদন সবই ছিল অনন্য, অপূর্ব, অতুলনীয়। যা মুখে কিংবা লিখে বলা সম্ভব নয়। তাই তো তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেছেন, 'কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র।'

এরপর আর কিছু ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা আমার কলমের নেই। রাব্বুল আলামীনের কছে একটাই মিনতি, 'রহীম ও রহমান! একটি বার তোমার রাহমাতুল্লিল আলামীনকে স্বপ্নে দেখার তাওফীক দিও। তাঁর শাফা'আত নসীবে রেখ।'

(তথ্যসূত্র : শামায়েলে তিরমিযী, সুনানে আবী দাউদ, মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-নাঈম সিদ্দিকী)

শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)

যতদিন পর্যন্ত মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও যোগ্যতা এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়নি, যাতে করে কোনো নবীর বাণী ব্যাপকভাবে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে কিংবা কোনো শিক্ষা বা চারিত্রিক আদর্শ সংরক্ষণ করতে পারে, ততদিন পর্যন্ত মহান রাব্বুল আলামীন ধারাবাহিকভাবে নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। যখনই বিশ্বের অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে, মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি হয়েছে, যাতে করে কোনো নবীর বাণী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং নবীর শিক্ষা ও তাঁর চারিত্রিক আদর্শ সংরক্ষণ করে পরবর্তী মানবগোষ্ঠীর কাছে পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, তখন বিশ্বে নতুন করে আর কোনো নবী প্রেরণের প্রয়োজন হয়নি।

তাঁর আগমনের পূর্ব অবস্থা

যে সময় দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি আলাদা আলাদা ছিল, কারো সাথে কারো যোগাযোগ বা মেলামেশা ছিল না। তাদের শিক্ষা তাদের জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অজ্ঞতাও ছিল প্রচুর। শিক্ষা-দীক্ষা তো ছিল না বললেই চলে। এ অবস্থায় কোনো সাধারণ শিক্ষা সকল জাতির মধ্যে প্রচলন করা দুরূহ ব্যাপার ছিল। তাই মহান বিজ্ঞ কুশলী আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতির জন্য আলাদা আলাদা নবী পাঠিয়েছেন এবং নবুওয়াতের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, এভাবে কত দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। এরপর উন্নতি লাভ করতে করতে একদিন সেই সময় উপস্থিত হতো, যখন ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প কারিগরি উন্নতির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হলো। দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশের

www.amarboi.org

সাথে নৌ-চলাচল ও স্থলপথে যাতায়াত শুরু হলো। সভ্যতা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচারের আদান-প্রদান হতে লাগল। বড় বড় যোদ্ধা জন্ম নিল, যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বা দেশকে একত্রিত করে এক সমাজের অধীন করল। এভাবে বিচ্ছিন্ন মানবজাতির মধ্যে যে দূরত্ব ও ব্যবধান ছিল তা ধীরে ধীরে কমতে লাগল এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য এক শিক্ষা ও এক শরীআত পাঠানোর মতো পরিবেশ সৃষ্টি হলো। অবস্থার এতটা উন্নতি হলো, যাতে তারা নিজেরাই সবার উপযোগী একটি ধর্ম প্রত্যাশা করতে লাগল।

ধর্ম তো সেই জীবনব্যবস্থা, যা মানবজীবনের, মানবসমাজের সকল দিককে নিয়ন্ত্রণ করে দিকনির্দেশনা দেয়। সে হিসেবে বৌদ্ধধর্ম কোনো পূর্ণাঙ্গ ধর্ম নয়। এ ধর্মে মাত্র কয়েকটি নৈতিক বিধানের অস্তিত্ব আছে। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে একদিকে চীন, মঙ্গোলিয়া, জাপান পর্যন্ত, অন্যদিকে আফগানিস্তান ও বোখারা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। এর কয়েকশ' বছর পর ঈসায়ী ধর্মের আবির্ভাব। ঈসা (আ.) যদিও আল্লাহর তরফ থেকে আসমানী কিতাব এবং ইসলাম নিয়েই এসেছিলেন, কিন্তু তাঁকে দুনিয়া থেকে তুলে নেওয়ার পর তাঁর অনুসারীরা এ ধর্মকে সংশোধন(?) সংযোজন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে বিকৃত ও পঙ্গু করে ফেলে। ঈসায়ীরা এ বিকৃত ধর্মকেই ছড়িয়ে দিল ইরান থেকে নিয়ে ইউরোপের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত। এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, প্রচার-প্রসারের জন্য বিশ্ব যখন উপযোগী হয়েছিল, ঠিকএ সময়ই আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার শিক্ষকরূপে একজন রাসূল আরব দেশে পাঠালেন, সারা বিশ্বের সকল ভ্রান্ত মতবাদ এ শিক্ষা-দীক্ষার ওপর ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত এবং দীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি এ দীনকে অন্য সকল দীনের ওপর বিজয়ী করেন। মুশরিকদের কাছে তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।' (সূরা সফ্ : ৯)

কুরআন মাজীদের আরো দুই স্থানে এ ঘোষণা এসেছে, সূরা তাওবার ৩৩ নং আয়াতে এবং সূরা ফাত্হ-এর ২৮ নং আয়াতে।

অতএব নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ (সা.)-এর শিক্ষা ও কুরআন মজীদ ছাড়া আল্লাহ তাআলার সত্য-সঠিক পথ জানার আর কোনো মাধ্যম নেই। নবী আগমনের ধারাবাহিকতা খতম বা শেষ করে দেওয়া হয়েছে। এ পৃথিবীর মানুষের জন্য আল্লাহ তরফ থেকে যা কিছু নিয়ম-কানুন, আইন-বিধান, পদ্ধতি আসার প্রয়োজন ছিল তার সবকিছু শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন যদি কেউ দুনিয়ার শান্তি এবং আখিরাতের মুক্তির জন্য সত্য,

www.amarboi.org

সঠিক, সরল পথের সন্ধান জানতে চায়, তাকে মুহাম্মাদ (সা.)-এর নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করতে হবে।

খতমে নবুওয়াতের প্রমাণ

একজন নবীর আগমনের পর আর একজন নবী আসার চারটি কারণ থাকতে পারে :

১. প্রথম নবীর শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সেই শিক্ষা পুনরায় পেশ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

২. প্রথম নবীর শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়, তার মধ্যে সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

৩. প্রথম নবীর শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট জাতির জন্য। এখন ভিন্ন জাতির জন্য আরেকজন নবীর প্রয়োজন।

৪. এক নবীর সাহায্যের জন্য আরেকজন নবীর প্রয়োজন।

সেক্ষেত্রে নবীদের শিক্ষা ও হেদায়াতের জীবনই হচ্ছে নবীদের জীবন। যতদিন পর্যন্ত এক নবীর শিক্ষা ও হেদায়াত অবিকৃতভাবে কার্যকর থাকবে, ততদিন অন্য কোনো নবীর আবশ্যকতা নেই। তাই আল্লাহ তাআলাও নবী পাঠান না। আসমানী কিতাব চারখানা। কুরআন বাদে বাকি তিনখানা কিতাবই বিকৃতির শিকার। ওই সকল নবীর উম্মতের তাদের নবীর শিক্ষা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথাও নির্ভুলভাবে বলতে পারবে না। এমনকি তারা কোথায় জীবন যাপন করেছেন, কী কী কথা ও কাজ থেকে মানুষকে বিরত রেখেছেন, আর কী বলতে বলেছেন, কোন্ সব কাজ করতে বলেছেন, তাও নিশ্চিতভাবে জানা যায় না, কিন্তু মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনকাল এখনো চলছে। কারণ তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াত বেঁচে আছে, অবিকৃত আছে। প্রায় ১৫০০ বছর পার হয়ে গেছে, কুরআনের একটি হরফেরও রদ-বদল হয়নি। দুনিয়ার কোনো ব্যক্তির জীবন রাসূল (সা.)-এর জীবনের মতো সংরক্ষিত নেই। আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান রাসূল (সা.)-এর জীবন থেকে নিতে পারি। তাঁর আনীত শরীআতে না কোনো সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে, না কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়েছে। রাসূলে করীম (সা.)-এর পরে যে আর কোনো নবী আসবে না এটাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। মুহাম্মাদ (সা.) যে শেষ নবী– খাতামুন নাবিয়্যিন, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সর্বকালের একমাত্র নবী, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

'হে নবী! আমি তো আপনাকে দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।' (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

www.amarboi.org

'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে এসেছি।' (সূরা আ'রাফ : ১৫৮)

'আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ দানকারী ও ভয়ভীতি প্রদর্শনকারী করে পাঠিয়েছি।' (সূরা সাবা : ২৮)

'মুহাম্মাদ (সা.) তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। আর আল্লাহ সব বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।' (সূরা আহযাব : ৪০)

কুরআন মাজীদে আরো অনেক আয়াত আছে, যা প্রমাণ করে, রাসূল (সা.)-ই শেষ নবী এবং সমগ্র বিশ্বের নবী। এবার দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি হাদীস পেশ করছি :

১. রাসূল (সা.) বলেন, 'বনী ইসরাইলের নেতৃত্ব দিতেন আল্লাহর রাসূলগণ, যখন কোনো নবী ইন্তিকাল করতেন তখন অন্য নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে কোনো নবী হবেন না, হবে শুধু খলীফা। (বুখারী)

২. রাসূল (সা.) বলেন, 'আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হলো এই যে, এক ব্যক্তি একটি দালান তৈরী করল এবং সুন্দর শোভনীয় করে সেটি সজ্জিত করল, কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান শূন্য ছিল। দালানটির চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল, এ স্থানে একটি ইট রাখা হয়নি কেন? আমিই সেই ইট। আমিই শেষ নবী। (বুখারী)

মুসলিম শরীফের হাদীসে এ অংশটুকু বেশি বলা হয়েছে, 'তারপর আমি এসে নবীদের সিলসিলা খতম করে দিলাম।'

৩. রাসূল (সা.) বলেন, 'রিসালাত ও নবুওয়াতের সিলসিলা খতম করে দেওয়া হয়েছে, কাজেই আমার পরে আর কোনো রাসূল বা নবী আসবেন না।'

৪. রাসূল (সা.) হযরত আলী (রা)-কে বলেন, 'আমার সাথে তোমার সম্পর্ক মূসা ও হারূন (আ)-এর সম্পর্কের মতো, কিন্তু আমার পরে কোনো নবী নেই।' (বুখারী ও মুসলিম)

৫. রাসূল (সা.) বলেন, 'আর কথা হচ্ছে, আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশ জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে। অথচ আমার পরে আর কোনো নবী নেই।' (বুখারী)

মুহাম্মাদ (সা.)-এর পর আর কোনো নবী নেই– এ কথার দলিল হিসেবে আরো অনেক হাদীস পেশ করা যায়।

কুরআন-হাদীসের উপযুক্ত প্রমাণাদি পাওয়ার পরও যারা রাসূল (সা.)-কে শেষ

www.amarboi.org

নবী মানতে চায় না; আরো নবী আসতে পারে বলে যারা বিশ্বাস করে, তারা নিঃসন্দেহে মুরতাদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এমন ফিতনা থেকে হেফাযত করুন।

'বিশ্বনবীর মোজেযা'

নবী রাসূলগণ যখনই নিজেদেরকে মহান রাব্বুল আলামীনের বাণীবাহক বা রাসূল হিসেবে দাবী করেছেন তখনই লোকেরা বলেছে, তোমার দাবী যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের এমন কিছু দেখাও যা প্রচলিত নিয়মের ঊর্ধ্বে, অস্বাভাবিক, অলৌকিক কোনো ঘটনা। প্রথম তো তারা বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে কোনো মানুষ নবী হতে পারে? তারপর যদিও ধরে নেওয়া যায় যে মানুষকে রাসূল বানানো হবে, তাহলে অন্তত কোনো রাজা বাদশাহ কিংবা বড় কোনো ধনী লোককে নবী বা রাসূল না বানিয়ে বিশ্বস্রষ্টা একজন অতি সাধারণ মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন এটা তারা মানতে পারছিল না।

"তারা বলে, এ কেমন রাসূল। যে পানাহার করে এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠানো হলো না কেন যে তার সাথে থাকত এবং (অমান্যকারীদের) ধমক দিত?" (আল কুরআন : ৭)

অর্থাৎ তাদের মতে দুনিয়াতে নবীর যদি কোনো প্রয়োজন থাকে ও তা মানুষের হেদায়েতে জন্য না। অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম দেখিয়ে মানুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য।

আর কাফেরদের এই সব কথার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন "হে মুহাম্মাদ তোমার পূর্বেও আমি মানুষকেই রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে আমি অহী পাঠাতাম। তোমরা যদি তা না জান তাহলে আহলে কিতাবকে জিজ্ঞেস কর। তাদেরকে আমি এমন শরীর দেইনি, যার খাওয়ার প্রয়োজন হতো না। আর তারা চিরঞ্জীবও ছিল না।" (আল-আম্বিয়া : ৭)

মহান রাব্বুল আলামীন পথভ্রষ্ট মানুষদের হেদায়াতের জন্য যতো নবী, রাসূল পাঠিয়েছেন, সমকালীন পথভ্রষ্ট লোকেরা সব নবী, রাসূলদের কাছেই মোজেযা দেখতে চেয়েছে। তখন মহান আল্লাহ বিভিন্ন নবী রাসূলের জামানায় বিভিন্ন মোজেযা দেখিয়েছেন।

হযরত সালেহ (আ.) এর উষ্ট্রীর মোজেযা–

সালেহ (আ.) যখন তাঁর জাতিকে বললেন "আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো...। (সূরা আশ্-শুয়ারা : ১৪৩-১৪৪)

www.amarboi.org

এর জবাবে তারা বলল "তুমি আমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া আর কি? কোনো মোজেযা আনো যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো। তখন সালেহ বললো "এ উটনীটি রইল। এর পানি পান করার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট এবং তোমাদের সবার পানি পান করার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট রইল। একে কখনো হত্যা করো না, অন্যথায় একটি মহাদিবসের আযাব তোমাদের উপর আপতিত হবে।" (সূরা আশ শুয়ারা : ১৫৪-১৫৬)

সূরা আরাফ ও সূরা হূদে বলা হয়েছে "এ হচ্ছে আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্য মোজেযা সরূপ। একে আল্লাহর জমিনে চরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দাও। কখনো খারাপ মতলবে এর গায় হাত দিয়ো না। নইলে তোমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কবলে পড়বে। (সূরা আরাফ : ৭৩)

দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ উটনী তাদের মধ্যে ছিল।

সালেহ (আ.) বলেছিলেন "এই উষ্ট্রী তোমাদের ক্ষেত খামারে অবাধে চরে বেড়াবে। একদিন সে এক পানি খাবে। অপর দিন অন্য সকলের জন্তু জানোয়ার পানি খাবে। তোমরা যদি তার কোনো ক্ষতি করো তাহলে তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব নেমে আসবে।"

এইভাবে দীর্ঘদিন চলতে থাকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা বেশ কিছু দিন উটনীর অত্যাচার সহ্য করে। লোকেরা মনে মনে এর বিরুদ্ধে ফুঁসতে থাকে। পরামর্শ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত জাতিকে আপদ মুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে কাণ্ড জ্ঞানহীন এক সরদার। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলেন "যখন এ জাতির সবচেয়ে হতভাগা পাপিষ্ঠ লোকটি উটনীটিকে হত্যা করার জন্য উদ্যোগী হলো।" (সূরা শামস : ১২)

সূরা কামারে বলা হয়েছে "তারা নিজেদের সাথীকে আহবান জানালো, শেষ পর্যন্ত সে একাজটি নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিল এবং সে গিঁঠের রগ কেটে দিল।" (সূরা কামার : ২৯)

"এরপর আযাব তাদের গ্রাস করল।" (সূরা আশ শুয়ারা : ১৫৮)

কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। উটনীকে মেরে ফেলার পর সালেহ (আ.) ঘোষণা করেন" তিন দিন নিজেদের ঘরে আয়েশ আরাম করে নাও।" (হূদ : ৬৫)

"এই বিজ্ঞপ্তি শেষ হবার পর রাতের শেষ প্রহরে, ভোরের কাছাকাছি সময়ে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। এ সংগে সংঘটিত হয় ভয়াবহ ভূমিকম্প। ফলে মুহূর্তের

www.amarboi.org

মধ্যে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। সকাল হবার পর চার দিকে লাশের পর লাশ এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল যেন মনে হচ্ছিল, শুকনো লতাগুল্ম জন্তু-জানোয়ারের পদ দলনে বিধ্বস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। তাদের সুরম্য প্রাসাদ এবং পার্বত্য গুহাগুলো তাদেরকে এ ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেনি।" (তাফহীমুল কুরআন)

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মোজেযা চারটি পাখী জীবিত করার ঘটনা–

"সেই ঘটনাটি ও স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে রব! তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিতক করো, তা আমাকে দেখাও। আল্লাহ বললেন "তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম বললেন বিশ্বাস তো করি কিন্তু মনের প্রশান্তির জন্য। আল্লাহ বললেন তাহলে চারটি পাখি নিয়ে তাদেরকে তোমরা পোষ মানাও। তারপর তাদের খণ্ডিত অংশ এক একটি পাহাড়ের উপর রাখ। তারপর তাদের ডাক দাও। তারা তোমার কাছে ছুটে চলে আসবে। জেনে রাখ যে আল্লাহ অতিশয় পরাক্রমশালী ও নিপুণ কুশলী। (বাকারা : ২৬০)

এ ছাড়া বার্ধক্যে হযরত ইবরাহীমের সন্তান লাভ। অগ্নিকুণ্ড থেকে নিষ্কৃতি লাভ এসব ও ছিল মোজেযা।

হযরত মূসা (আ.)-এর মোজেযা ছিল বোধ হয় সবচেয়ে বেশী। মূসা (আ.) কে নয়টি সুস্পষ্ট মোজেযা দেওয়া হয়েছিল। সূরা আরাফে এই নয়টি মোজেযার উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো–

১. লাঠি– যা সাপে রূপান্তরিত হতো।

২. উজ্জ্বল হস্ত– যা বগল থেকে বের করে আনলেই সূর্যের মত আলো ঝলমল করতো।

৩. জাদুকরদের জাদুকে জনসাধারণ্যে পরাজিত করা।

৪. একটি ঘোষণা অনুসারে সারাদেশে দুর্ভিক্ষ হওয়া।

৫. লাঠি দ্বারা সাগরের তলদেশে শুষ্ক সড়ক তৈরী করা।

৬. মান্না ও সালওয়া পাওয়া।

৭. ক্রমাগত তুফান।

৮. পঙ্গপান, উই পোকা ব্যাঙ অবতীর্ণ হওয়া।

৯. রক্ত বৃষ্টি-পাত হওয়া।

এমনি প্রায় সব নবীদের জন্য কিছু কিছু নিদর্শন বা মোজেযা দিয়েছেন মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা।

www.amarboi.org

শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর মোজেযা–

শেষ নবী, বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে বস্তুগত মোজেযা দেওয়ার পরিবর্তে জ্ঞানগত মোজেযা দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও আল-কুরআনের মতো গ্রন্থ তাঁর ওপর নাযিল হওয়াটাই এত বড় মোজেযা যে তাঁর রাসূল হওয়ার ব্যাপারে এই নিদর্শন-ই যথেষ্ট। তিনি যে আল্লাহর রাসূল এ কথা বিশ্বাসের জন্য কুরআন পড়া কিংবা শোনার পর আর কোনো মোজেযার প্রয়োজন থাকে না। আল-কুরআন এমন এক কালজয়ী এবং চিরন্তন মোজেযা যা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের সামনে থাকবে।

মহান আল্লাহ বলেন "তারা বলে এ লোকটির উপর তার প্রভুর পক্ষ থেকে কোনো মোজেযা অবতীর্ণ করা হয়নি কেন? তুমি বল, মোজেযাসমূহ আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আমি শুধু পরিষ্কার ভাষায় সাবধানকারী। তাদের জন্য এ মোজেযা কি যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি যা পড়ে পড়ে তাদেরকে শোনানো হচ্ছে? আসলে এতে রয়েছে করুণা ও উপদেশ তাদের জন্য যারা ঈমান আনে।" (সূরা আনকাবুত : ৫০-৫১)

মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বাস্তব অবস্থার উল্লেখ করে বলেন, এ নিরক্ষর মানুষটির মুখ দিয়ে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের জীবন বৃত্তান্ত। সাবেক ধর্মসমূহের আকীদা ও বিশ্বাস। আদিম জাতিসমূহের ইতিহাস সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও চারিত্রিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ওপর যে ব্যাপক ও গভীর তত্ত্ব জ্ঞানের অভিব্যক্তি ঘটেছে তা অহি ছাড়া আর কোনো পন্থায় অর্জন করতে পারে না। তিনি যদি লেখা পড়া জানতেন এবং লোকেরা তাকে বই পুস্তক পড়তে ও জ্ঞান-গবেষণা করতে দেখতো তাহলে তারা ভাবতে পারত যে এ জ্ঞান তাঁর নিজস্ব চেষ্টা সাধনা দ্বারা অর্জিত হতে পারে। অথচ সর্বজনবিদিত সত্য যে তিনি নিরক্ষর ছিলেন।

স্বয়ং রাসূল (সা.) এবং মুসলমানরা কাফেরদের পক্ষ থেকে বার বার মোজেযার দাবী শুনে অস্থির হয়ে উঠতেন এবং মনে মনে ভাবতেন এদের বিশ্বাস জন্মানোর মতো কিছু মোজেযা দেখিয়ে দেওয়া হলে কতই না ভালো হতো। কিন্তু আল্লাহ জানেন এই শ্রেণীর মানুষদের মোজেযা দেখালেও এরা ঈমান আনে না। আল্লাহ বলেন, "এমন কোনো কুরআন যদি নাযিল করা হতো, যার জোরে পাহাড় চলতে আরম্ভ করে দিত। পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে যেতো অথবা মৃত ব্যক্তি কবর থেকে বেরিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিত। তাহলেই বা কি লাভ হতো?" (আর-রাদ : ৩১)

www.amarboi.org

উপরোক্ত আয়াতে কাফেরদের সাথে নয় মুসলমানদের সাথে কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে তোমার কি তাদের সম্পর্কে এতই আশাবাদী যে শুধু একটা মোজেযা দেখালেই তারা মুমীন হয়ে যাবে? আসলে এই কুরআন দেখে কিংবা শুনেও যারা ঈমান আনে না। যারা বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন নিদর্শন রাসূল (সা.) এর নিষ্কলুষ জীবন, সাহাবা (রা.)-দের বৈপ্লবীক পরিবর্তন দেখেও সত্যের আলো দেখতে পায় না তারা পাহাড় চলতে শুরু করলে কিংবা মৃত্যু ব্যক্তি কবর থেকে জীবিত বের হয়ে আসলেও ঈমান আনবে না। পূর্ববর্তী নবী রাসূলেরা যেসব মোজেযা দেখিয়েছেন তাতে তখনকার অবিশ্বাসী মানুষদের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি?

অবশ্য সকল কাফের মুশরিকদের ঈমান আনতে এবং আল্লাহর আনুগত্য মেনে নিতে এমন কিছু করা আল্লাহর মোটেও কোনো কঠিন কাজ নয়। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা বলেন "আমি ইচ্ছা করলে আসমান থেকে এমন নিদর্শন নামিয়ে দিতে পারি। যার সামনে তাদের মাথা নুয়ে পড়বে।" (আশ্-শুয়ারা : ৪)

০ "তোমার প্রভু যদি চাইতেন তাহলে দুনিয়ার সমস্ত অধিবাসী মু'মিন হয়ে যেত। তুমি কি এমন মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করতে চাও?" (ইউনুস : ১৯)

০ তিনি চান লোকেরা নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধি খাটিয়ে আল্লাহর কিতাব, বিশ্ব প্রকৃতির সর্বত্র এবং স্বয়ং তাদের মধ্যে যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে তার সাহায্যে সত্যকে উপলব্ধি করুক। তারপর যখন তাদের মন সাক্ষ্য দেবে যে নবীগণ যা বলেছেন আসলে সেটাই সত্য আর তার বিপরীত যত সব আকীদা বিশ্বাস ও রীতি পদ্ধতি চালু রয়েছে তা সবই বাতিল ও অসত্য। তখন তারা জেনে বুঝে বাতিলকে ত্যাগ করে সত্যকে অবলম্বন করবে। এভাবে স্বেচ্ছায় ঈমান আনা বাতিলকে বর্জন করা এবং সত্যের অনুসরণ করাই এমন কাজ যা আল্লাহ তায়ালা মানুষের কাছে দাবী করেন। এ কারণেই তিনি মানুষকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দান করেছেন। এ কারণেই তিনি মানুষকে এ স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, সে ইচ্ছা করলে সঠিক অথবা ভ্রান্ত যে কোনো একটা পথ গ্রহণ করতে পারে। এ কারণেই তিনি মানুষের মধ্যে ভালো ও পুণ্য উভয়ের পথই তার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। শয়তানকে ধোকা দেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষকে ঈমান ও আনুগত্য বাধ্য করে এমন কোনো ব্যবস্থা যদি আল্লাহ গ্রহণ করতেন তাহলে পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেতো। ঈমান আনতে মানুষকে বাধ্য করাই যদি তাঁর ইচ্ছা হতো তাহলে মোজেযা দেখিয়ে বাধ্য করার কি দরকার ছিল?

আল্লাহ মানুষকে এমন স্বভাব-প্রকৃতি ও এমন গঠন দিয়ে সৃষ্টি করতে পারতেন যে, কুফরী, নাফরমানী ও পাপাচারের কোনো ক্ষমতাই তার থাকতো না।

www.amarboi.org

ফেরেশতাদের মতো মানুষও ফরমাবরদার ও অনুগত হয়েই জন্ম নিত। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সেই সত্যটিই তুলে ধরেছেন।" (সীরাতে সরওয়ারে আলম)

যুগে যুগেই কাফের মুশরিকেরা সমসাময়িক নবী-রাসূলদের কাছে মোজেযা দেখতে চেয়েছে এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁরা মোজেযা দেখিয়েছেন। একথা ও সত্য যে মোজেযা দেখা সত্ত্বেও তারা ঈমান গ্রহণ করেনি। আমাদের নবী (সা.) যখন দেখলেন যে এই সব মুসরিকদের বুঝাতে বুঝাতে দীর্ঘ দিন কেটে যাওয়া সত্যেও তারা ঈমান আনছে না তখন মাঝে মাঝে তাঁর আন্তরেও এ আকাঙ্ক্ষা জাগতো "আহা! যদি এমন কোনো মোজেযা দেখাতে পারতাম যাতে কাফের মুশরিকেরা ঈমান আনতো...।

তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে মৃদু ধমক আসে রাসূল (সা.) এর প্রতি "তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে কিন্তু তাদের উপর যে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে এবং যে কষ্ট দেয়া হয়েছে। তাতে তারা সবর করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে গেছে। আল্লাহর কথাগুলো পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোর নেই, আগের রাসূলদের সাথে যা কিছু ঘটে গেছে তার খবর তো তোমার কাছে পৌঁছে গেছে। তবুও যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে থাকে তাহলে তোমার মধ্যে কিছু শক্তি থাকলে তুমি ভূগর্ভে কোনো সুড়ংগ খুঁজে নাও অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগাও এবং তাদের কাছে কোনো মোজেযা আনার চেষ্টা করো। আল্লাহ চাইলে এদের সবাইকে হেদায়াতের উপর একত্র করতে পারতেন। কাজেই মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সূরা আন'আম : ৩৪-৩৫)

তার মানে রাসূল (সা.) আপন উদ্যেগে মোজেযা দেখাতে সক্ষম ছিলেন না। শুধু রাসূল (সা.) কেন কোনো নবী রাসূল-ই আপন উদ্যোগে মোজেযা দেখাতে পারেননি। মহান রাব্বুল আলামীন যাকে যতটুকু মোজেযা দেখানোর তৌফিক দিয়েছেন সে ততটুকুই দেখিয়েছেন। নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে দেওয়া হয়েছে ছয় হাজার ছয়শত ছেষট্টি (আয়াত) নিদর্শন বা মোজেযা সম্বলিত আল-কুরআন।

"তারা বলে যে মুহাম্মাদ তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে একটা মোজেযা (নিদর্শন) নিয়ে আসে না ক্যান? তাদের কাছে কি পূর্বতন গ্রন্থসমূহের সকল শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে আসে নি?" (সূরা ত্বহা : ১৩৩)

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) বলেন "উম্মী হওয়া সত্ত্বেও আল-কুরআনের মতো গ্রন্থ নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর নাযিল হওয়াটাই এত

www.amarboi.org

বড় মোজেযা যে, তাঁর রাসূল হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যে তা যথেষ্ট। এরপর আর কোনো মোজেযার প্রয়োজনই থাকেনা। অন্যান্য মোজেযাও কেবল তাদের-ই জন্য যারা মোজেযা দেখেছিল। কিন্তু কুরআন এমন কালজয়ী ও চিরন্তন মোজেযা, যা সব সময় তারা তা দেখতে পারে।" (সীরাতে সরওয়ারে আলম)

নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে বস্তুগত মোজেযার পরিবর্তে দেয়া হয়েছে জ্ঞানগত মোজেযা। রাসূল (সা.)-এর সমকালিন আরব বিশ্ব ছিল কাব্য সাহিত্যে সমৃদ্ধ। যেমন মূসা (আ.)-এর সমকালিন মিশর ছিল যাদু বিদ্যায় সমৃদ্ধ, তাই মহান প্রজ্ঞাময় আল্লাহ মূসা (আ.)-কে এমন মোজেযা দিয়ে ছিলেন যা তৎকালিন সমস্ত বড় বড় যাদুকে নিস্প্রভ করে দিয়েছিল এবং বড় বড় সব যাদুকরেরা মূসা (আ.)-এর আনুগত্য গ্রহণ করেছিল।

তেমনি শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর নাযিল করেছেন এমন অবিসংবাদিত মহিমা সম্বলিত আল-কুরআন যার সীমাহীন শাশ্বত আলৌকিকতায় আজও বিশ্ব বিস্ময়াভিভূত। সমগ্র জীন ইনসান মিলিত হয়ে হাজার বছর সাধনার পরও এই কুরআনের একটি ক্ষুদ্র পংক্তির মতো পংক্তি রচনা করতে যে সক্ষম নয় তা কুরআন নিজেই চ্যালেঞ্জের সুরে ঘোষণা দিয়েছে–

০ "এরা কি বলছে, নবী নিজেই এ কিতাবটি রচনা করেছে? বলো, ঠিক আছে, তাই যদি হয়, তাহলে এর মতো দশটি সূরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর যেসব মাবুদ আছে তাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকতে পারলে ডেকে নাও যদি তোমরা সাচ্চা হতে থাকে।" (সূরা হূদ : ১৩)

০ বলে দাও, যদি মানুষ ও জিন সবাই মিলে কুরআনের মতো কোনো একটি জিনিস আনার চেষ্টা করে তাহলে তারা আনতে পারবে না, তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়ে গেলেও। (বনী ইসরাইল : ৮৮)

০ তারা কি বলে রাসূল নিজেই এটি তৈরী করেছে? আপনি বলুন : তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস এবং ডেকে নাও যাকে পার আল্লাহকে বাদে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা ইউনুস : ৩৮)

০ তারা কি বলে যে, এ ব্যক্তি নিজেই কুরআন রচনা করে নিয়েছে? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তারা ঈমান গ্রহণ করতে চায় না। তাদের এ কথার ব্যাপারে তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে এ বাণীর মত একটি বাণী তৈরী করে আনুক।" (সূরা আত্-তুর)

সূরা বাকারার ২৩ নং আয়াতেও আল্লাহ অনুরূপ কথাই বলেছেন।

www.amarboi.org

০ "আর যে কিতাবটি আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করেছি সেটি আমার কিনা– এ ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করে থাকো তাহলে তার মতো একটি সূরা তৈরী করে আনো এবং নিজেদের সমস্ত সমর্থক গোষ্ঠিকে ডেকে আনো। এক আল্লাহকে ছাড়া আর যার যার চাও তার সাহায্য নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে একাজটি করে দেখাও। (সূরা বাকারা : ২৩)

এই কুরআন এমন একখানা কিতাব যার মধ্যে,

১. কোনো ভুল বা অসংগতি নেই।

২. ছোট খাট, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিকৃতি থেকে ও কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত।

৩. লক্ষ লক্ষ মানুষ এই কুরআন কণ্ঠস্থ করে রেখেছে। যা কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাল্লাহ।

কাফের মুশরিকদের ঈমান গ্রহণের শর্ত হিসাবে রাসূল (সা.) মোজেযা না দেখালেও তাঁর গোটা জীবনকাল আপাদমস্তক-ই তো মোজেযা। যা তার ভক্ত অনুরক্ত সাহাবীরা দেখেছেন। যার কয়েকটি উল্লেখ করছি।

১. মসজিদে নববীতে মিম্বর তৈরী হবার আগে রাসূল (সা.) একটি শুষ্ক খেজুর গাছের খুটির সাথে হেলাল দিয়ে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। যখন তার জন্য মিম্বার তৈরী করা হলো তখন তিনি মিম্বারে বসে প্রথম যেদিন খুতবা দিতে শুরু করেন সে দিন শুষ্ক খেজুর গাছটির ভেতর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসতে থাকে। অভিমানী বাচ্চাদের মতো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না। রাসূল (সা.) মিম্বার থেকে নামিয়ে আসেন, শুষ্ক খেজুর বৃক্ষটিকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন, কাঁদতে নিষেধ করেন। আস্তে আস্তে গাছটির কান্না থেমে যায়। এ দৃশ্য সেদিন উপস্থিত সব সাহাবীরাই দেখেছেন।

২. ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরাইশ মুশরিকরা রাসূল (সা.), তাঁর পরিবার পরিজন এবং তাঁর অনুসারীদের শেবে আবু তালিব নামে এক উপত্যকায় অবরুদ্ধ করে। সেদিন সকল কুরাইশ নেতারা একত্রিত হয়ে একটা অঙ্গিকার পত্র লিপিবদ্ধ করে। এই অঙ্গিকার পত্রে বিরোধী সব নেতারা সাক্ষর করে এবং আমৃত্যু মেনে চলার ধারা সমূহ–

১. মুহাম্মাদের সকল অনুসারী ও সমর্থকদের সাথে সব ধরনের কেনা-বেচা নিষিদ্ধ করা হলো।

২. তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ও মেলামেশা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলো।

৩. মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার কারো থাকবে না।

www.amarboi.org

নবুওয়তের সপ্তম বছরের মহররম মাসে মক্কার সব গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে বনু হাশেমকে বয়কট করার জন্য এই চুক্তি সম্পাদন করে।

এই বয়কট তিন বছর কার্যকর ছিল। এই তিন বছর অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে পার করেন রাসূল (সা.) এবং তার অনুসারীরা। না খেয়ে থাকার কষ্ট যখন চরম পর্যায় অতিক্রম করে তখন কয়েকজন কুরাইশ যুবকের মধ্যে মানবতাবোধ জেগে উঠে। তারা এই চুক্তি বাতিলের জন্য কুরাইশ নেতা আবু জাহেলের সাথে বাগবিতণ্ডা করতে থাকে। মহানবী (সা.) চাচা আবু তালিবকে জানালেন চুক্তিপত্রের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আবু তালিব উপত্যকা থেকে বের হয়ে পবিত্র কাবায় আসলেন। এবং অবরোধ তুলে নিতে বললেন। কুরাইশ নেতারা বলল, "যে চুক্তি আল্লাহর নামে করা হয়েছে তা আমরা তুলে নিতে পারি না। আবু তালেব বললেন "মুহাম্মাদ (সা.) তার রবের কাছ থেকে একটি সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছে। যদি তাঁর কথা সত্য হয় তাহলে কি তোমরা তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থাকবে?"

তারা বলল "হ্যাঁ"

আবু তালেব আবার বললেন "আর যদি তার কথা মিথ্যা হয় তাহলে আমিও তাঁকে তোমাদের হাতে তুলে দেব। তোমরা তাঁকে হত্যা করো। লোকেরা খুশী হলো। বলল "আবু তালেব এখন ন্যায় পথেই অগ্রসর হচ্ছে।"

আবু তালেব বললেন "মুহাম্মাদ বলেছেন– উইপোকা চুক্তিপত্রটি খেয়ে ফেলেছে।" চুক্তি পত্রটি নামিয়ে আনা হলো। লোকেরা দেখল– চুক্তি পত্রটির প্রথমে আল্লাহর নামে লেখা হয়েছিল শুধু ঐটুকু বাদে– গোটা চুক্তি পত্রটি উইপোকায় খেয়ে ফেলেছে। এরপর সর্বসম্মতিক্রমে অবরোধের অবসান হলো। উইপোকার চুক্তি পত্র খেয়ে ফেলার বিষয়টি নবী (সা.) কিভাবে জানলেন তা নিয়ে তারা অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করলেও এতে কাফের মুশরিকদের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হলো না। তারা নবুওয়তের বিস্ময়কর এ মোজেযা দেখেও মুখ ফিরিয়ে নিল ও কুফরির পথেই অবিচল থেকে গেল।

৩. হিজরতের সময় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে কিছু মোজেযা দেখিয়েছেন। হিজরতের পূর্বক্ষণে মহানবী (সা.) হযরত আলীকে তাঁর বিছানায় ঘুমিয়ে থাকতে বললেন। হযরত আলী (রা.) রাসূল (সা.)-এর সবুজ চাদরটি দিয়ে আপাদ মস্তক ঢেকে তাঁর বিছানায় ঘুমিয়ে থাকলেন। শত্রুরা গৃহের চারিদিকে অবরোধ করে রেখেছেন এবং নবী (সা.) যাতে বের হয়ে চলে যেতে না পারে সতর্কতার সাথে তা পর্যবেক্ষণ করছিল। অপর দিকে আল্লাহর

www.amarboi.org

ইচ্ছা নবীকে শত্রুর কবল থেকে মুক্তি দেবেন। রাসূল (সা.) একমুঠো বালু হাতে নিলেন। সূরা ইয়াসিনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন "আমি ওদের সামনে একটি প্রাচীর ও পেছনে একটি প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং ওদেরকে ঢেকে দিয়েছি। ফলে ওরা কিছুই দেখতে পায় না।" এবং তাতে ফুঁ দিয়ে কাফিরদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন।

আল্লাহর অশেষ কুদরতে তাদের প্রত্যেকের চোখে সেই বালু পড়ল। তারা দুই হাতে চোখ ঢলতে লাগলো। আল্লাহর রাসূল তাদের সামনে দিয়েই বের হয়ে আবু বকরের বাড়ির দিকে গেলেন। তারা কেউ তা দেখতে পেল না।

৪. পথে উম্মে মা'আবাদের গৃহে রাসূল (সা.) কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন। উম্মে মা'আবাদের অনুমতি নিয়ে তার হাড় জির জিরে দুর্বল বকরী থেকে দুধ দোহন করেন। রাসূল (সা.)-এর সাথে তখন আরো কয়েকজন লোক ছিলেন। রাসূল সেই দুধ নিজে খেলেন, সঙ্গীদের খাওয়ালেন। উম্মে মা'আবাদকে খাওয়ালেন এবং বড় এক পাত্র দুধ তার ঘরে রেখে তিনি রওনা হলেন।

৫. উম্মে মা'আবাদের বাড়ী থেকে বের হয়ে মদীনার পথে কিছু দূর যেতেই আবু বকর (রা.) দেখলেন সুরাকা ইবনে মালেক তাদের অনুসরণ করছে। সুরাকা কুরাইদের পুরস্কারের লোভে খুঁজতে খুঁজতে রাসূল (সা.)-কে পেয়ে যায়। সুরাকার ভাষায়– "এক সময় আমি উপকূলীয় এলাকায় তাদের নিকট এসে পৌঁছালাম। হঠাৎ ঘোড়া লাফাতে লাগল। আমি পড়ে গেলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে নবী (সা.) নির্বিকারভাবে একাগ্রচিত্তে কুরআন তিলাওয়াত করছেন। কোনো দিকেই তাঁর খেয়াল নেই। হযরত আবু বকর (রা.) পিছন ফিরে আমাকে দেখছিলেন। হঠাৎ ঘোড়ার সামনের পা দু'খানি বালুর মধ্যে ঢেবে গেল। আমি আবার ঘোড়া থেকে পড়ে গেলাম। অনেক কষ্টে ঘোড়া নিজের পা উপরে তুলল।"

সুরাকা ভয় পেয়ে গেল। রাসূল (সা.)-এর কাছে ক্ষমা চাইল। মক্কার লোকদের মনোভাব রাসূল (সা.)-এর কাছে ব্যক্ত করল। এরপর ফিরে গেল।

৬. ষষ্ঠ হিজরিতে হোদাইবিয়ার সন্ধির পরে রাসূল (সা.) আরবের বাইরে দাওয়াতের কাজ সম্প্রসারণের দিকে নজর দেন। আরবের চার পাশের রাজা বাদশাহদের কাছে দাওয়াতী পত্র পাঠান বিভিন্ন দূতের মাধ্যমে। আবিসিনিয়া, বাহরাইন, দামেস্ক, রোম, ইরান প্রভৃতি দেশে রাসূল (সা.) প্রতিনিধি পাঠান। এদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূল (সা.)-এর পাঠানো দূতের হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ না করলেও উপঢৌকন, উপহার প্রেরণ করেন, বন্ধুত্বের হাত বাড়ান। কিন্তু ইরান সম্রাট খসরু পারভেজ অভিশয় বাড়াবাড়ি

www.amarboi.org

করে। সে দাম্ভিকতার আতিশয্যে সে রাসূল (সা.)-এর চিঠি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। আর বলে "আমাদের একজন প্রজার এতো দুঃসাহস হলো কি করে?" এরপর তার ইয়ামানস্থ গভর্ণর বাযানকে নির্দেশ দিল, চিঠির লেখককে অবিলম্বে গ্রেফতার করে নিয়ে এস। বাযান দু'জন রাজ কর্মচারী পাঠালো পারস্য সম্রাটের নির্দেশক্রমে রাসূল (সা.)-কে গ্রেফতার করার জন্য। তারা রাসূল (সা.)-কে কথাটা বলতেই তিনি বললেন, "আগামীকাল এসে সাক্ষাত করো।"

পরদিন সকালে তারা এলে রাসূল (সা.) বললেন "রাতে আল্লাহ তোমাদের সম্রাটকে তার ছেলের হাতেই হত্যা করিয়েছেন। খসরু যেমন আমার পত্রখানি টুকরো টুকরো করেছে আল্লাহ তার রাজ্যকে ঠিক তেমনি টুকরো টুকরো করে ফেলবেন। দেখবে খুব শীঘ্রই ইসলামের রাজ্য পারস্যের রাজধানী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। যাও বাযানকে বলিও সে যেন ইসলাম গ্রহণ করে। তাহলে আমি তাকে পূর্ব পদে বহাল রাখব।

৭. খায়বর বিজয়ের পর জয়নব নাম্নী এক এক ইহুদী নারী রাসূল (সা.)-কে দাওয়াত করে খুব সুন্দর করে গোশত রান্না করে তাঁর সামনে পেশ করে। হযরত এক টুকরো গোশত খেয়েই চিৎকার করে বললেন সাবধান এই গোশত কেউ খেওনা এতে বিষ মেশানো।" বশার নামক জনৈক সাহাবী এক টুকরো গোশত খেয়ে ফেলেছিলেন। তিনি সাথে সাথে মারা যান। রাসূল (সা.)-এর কিছুই হলো না। জয়নব পরে স্বীকার করে রাসূল (সা.) সত্যি আল্লাহর নবী কিনা তা পরীক্ষা করার জন্যই সে গোশতে বিষ মিশিয়েছে।

৮. একবার অজুর পানির অভাব দেখা দেয়। একজনের কাছে সামান্য পানি ছিল তা রাসূল (সা.)-এর কাছে আনা হলো। রাসূল (সা.) সেই পানির মধ্যে নিজের পবিত্র ডান হাত ডুবিয়ে দিলেন। তখন তাঁর মোবারক পাঁচটি আঙ্গুল থেকে ঝর্ণার মতো পানির ফোয়ারা নেমে এসেছিল। যা দিয়ে অনেক মানুষের অজু এবং খাওয়ার প্রয়োজন পূরণ হয়েছিল।

৯. খায়বর অভিয়ানের সময় রাসূল (সা.) হযরত আলীকে (রা.) সেনাপতি হিসেবে ঘোষণা করলেন। কিন্তু তখন হযরত আলী চোখের পীড়ায়, মারাত্মকভাবে অসুস্থ ছিলেন। রাসূল (সা.) স্বীয় মুখের একটু থুথু লাগিয়ে দিয়ে তার সুস্থতার জন্য দোয়া করেন। মুহূর্ত কালের মধ্যে আলী (রা.) এমনভাবে সুস্থ হয়ে যান যে মনে হয় তার চোখে আদৌ কোনো অসুখ ছিল না।

১০. হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) একদিন মাত্র এক পেয়ালা

www.amarboi.org

দুধ দিয়ে তাকেসহ বহু সংখ্যক আসহাবে সুফফাকে উদর পূর্তি করে দুধ পান করিয়ে ছিলেন।

১১. বদরের দুর্ভাগ্যজনক পরাজয়ের পর উমাইর বিন ওহাব ও সাফওয়ান বিন উমাইয়া দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে চত্বরে বসেছিল। সাফওয়ান বললো "এখন আর বেঁচে থাকার কোনো মজা নেই।"

উমাইর বললো "আমি যদি ঋণগ্রস্ত না থাকতাম। এবং আমার ছেলে মেয়ে নিয়ে ভাবনা না থাকতো তাহলে এক্ষুণি গিয়ে মুহাম্মাদ (সা.)-কে হত্যা করে আসতাম আমার ছেলেটাও এখনো মদীনায় বন্দী।"

সাফওয়ান তার ছেলে মেয়ে এবং ঋণের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করলো। উমাইর তৎক্ষণাৎ বাড়িতে এসে তার তলোয়ারে বিষ মেখে নিল এবং মদীনায় পৌঁছে গেল। তাকে দেখা মাত্র ওমর (রা.) গ্রেপ্তার করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মুখে হাজির করলেন।

রাসূল (সা.) বললেন "উমাইর কি উদ্দেশ্যে এসেছ?"

সে বলল "ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতে?"

রাসূল (সা.) বললেন "তলোয়ার ঝোলানো কেনো?"

উমাইর বলল "তাতে কি হয়েছে? তলোয়ার বদরে কোন কাজে লেগেছে?"

রাসূল (সা.) বললেন "তুমি কি কাবা গৃহে বসে সাফওয়ানের সাথে আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করো নি?"

কথাটা শুনে উমাইর হতবাক হয়ে গেল। সে বললো, "আল্লাহর কসম আপনি সত্যি আল্লাহর নবী। আমি ও সাফওয়ান ছাড়া আর কেউ একথা জানতো না।" (সীরাতে ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড)

১১. মক্কা বিজয়ের পর ফুজালা বিন উমাইর ও প্রতিশোধ স্পৃহার বশবর্তী হয়ে রাসূল (সা.)-কে হত্যার সংকল্প নিল। রাসূল (সা.) তখন কাবা শরীফের তাওয়াফ করছিলেন। এমন সময় ফুজালা তার সামনে এল। রাসূল (সা.) বললেন "ফুজালা মনে মনে কি মতলব আঁটছো?" "ফুজালা হতবুদ্ধি হয়ে বলল" কই? কিছু না তো?"

রাসূল (সা.) বললেন, "আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও"

বলে ফুজালার বুকের উপর হাত রাখলেন। সংগে সংগে তার মন স্বাভাবিক হয়ে গেল। ফুজালা বলেন, রাসূল (সা.) আমার বুকের উপর থেকে হাত তুলে নেবার পর আল্লাহর সৃষ্টি জগতে রাসূল (সা.)-এর চেয়ে আর কেউ আমার কাছে প্রিয় ছিল না। (সীরাতে ইবনে হিশাম : ২য় খণ্ড)

www.amarboi.org

এমনি একটি দুটি না। অসংখ্য মোজেযার ঘটনা আছে যা সহীহ হাদিস গ্রন্থে আছে। নিকট ও দূর ভবিষ্যতের অনেক ঘটনা দুর্ঘটনার কথা রাসূল (সা.) বলেছেন যা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। হচ্ছে এবং হবে। তাই বলে একথা ভাবার অবকাশ নেই যে রাসূল (সা.) গায়েব জানতেন। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা তাঁকে যত টুকু জানাতেন ততটুকুই তিনি জানতেন।

আবার বলব, তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি দিকই মোজেযা। তাঁর কথা ও কাজের মিল। তাঁর উদারতা সহিষ্ণুতা, তাঁর ক্ষমা, তাঁর ত্যাগ তাঁর আল্লাহভীতি ও প্রীতি, সব কিছু মিলিয়ে তাঁর চরিত্র– একি কোন ছোটখাট মোজেযা?

তিনি জীবনে একটিও মিথ্যা কথা বলেননি, ভুলক্রমে কোনো দিন অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করেননি, একথা কি কম আশ্চর্যজনক?

যার চরিত্রের উত্তম ব্যাখ্যা দিয়েছেন হযরত আয়েশা (রা.) "তোমরা কি কুরআন পড়নি? কুরআনই রাসূল (সা.)-এর চরিত্র।"

অর্থাৎ কুরআন যেমন আল্লাহ পাকের দেওয়া নিদর্শন বা মোজেযা, রাসূল (সা.) চরিত্র ও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিদর্শন বা মোজেযা। প্রত্যেকটি মানব চরিত্রের কোন না কোন দুর্বল দিক থাকে। যা মানুষ অন্য মানুষের কাছে গোপন করতে চায় অথচ রাসূল (সা.) তাঁর জীবনের প্রতিটি কথা, প্রতিটি ঘটনা প্রত্যেকের কাছে প্রকাশ করতে বলেছেন। এর চেয়ে বড় মোজেযা আর কি হতে পারে?

শিশুদের প্রতি রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা

রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা এবং কল্যাণ কামনা ছিল সবার প্রতি। তাঁর ভালোবাসার পরিধি অনেক বড় ছিল। বৃক্ষ, পশু-পাখিও বাদ পড়েনি তাঁর ভালোবাসা থেকে। "অকারণে গাছের ডাল ভেঙ্গো না গাছ কষ্ট পায়।" গাছের প্রতি কি দরদ-ই না ফুটে উঠেছে এই কথার মধ্যে। তেমনি উটের প্রতি ভালোবাসা। হরিণের প্রতি ভালোবাসা, বেড়ালের প্রতি, পাখির বাচ্চার প্রতি কি নিবিড় ভালোবাসা দেখি আমরা তাঁর চরিত্রে, তাঁর শিক্ষায়।

আর মানুষের প্রতি তো তাঁর ভালোবাসা ছিল অপরিসীম অতুলনীয়। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালার ভাষায় তিনি ছিলেন "রহমাতুল্লিল আলামীন"

শিশুদের তিনি অসম্ভব ভালোবাসতেন। শিশুদের শুধু ভালোবাসাতেন-ই না, ভালোবাসার জন্য তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সে নির্দেশ অমান্য করলে দল থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেন "যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমার দলের না।"

www.amarboi.org

কেউ শিশুদের ভালো না বাসলে তাকে তিনি তিরস্কার করতেন। একবার রাসূল (সা.) তাঁর দুই দৌহিত্র হাসান ও হুসাইনকে চুমু দিচ্ছিলেন তা দেখে আফরা ইবনে হারিস (রা.) বললেন "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার কন্যার সন্তানদের চুমু দিচ্ছেন? আল্লাহর কসম! আমার দশ দশজন সন্তান রয়েছে, আমি এদের কাউকে কোনো দিন চুমু দেইনি।"

তখন রাসূল (সা.) বললেন "তোমার অন্তর থেকে যদি আল্লাহ পাক রহমত তুলে নিয়ে থাকেন তো আমার কি করার আছে?"

শিশুদের কান্না রাসূল (সা.) একদম সহ্য করতে পারতেন না। একদিন সকালে তিনি ফাতিমা (রা.)-র বাড়ির পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তাঁর কানে হুসাইনের কান্নার শব্দ ভেসে এলো। মহানবী (সা.)-এর কাছে খুব খারাপ লাগলো। তিনি ফাতিমার (রা.) বাড়িতে এসে রাগত : স্বরে বললেন "তুমি কি জাননা যে হাসান হুসাইনের কান্না আমাকে কষ্ট দেয়?"

তিনি নামাজকে সংক্ষিপ্ত করে দিতেন'। কারণ শিশুটির মা হয়ত নামাজে আছে। শিশুর কান্নায় তার নামাজে ব্যাঘাত হতে পারে। তিনি বলতেন, "শিশুর মাকে কষ্ট দেয়া পছন্দ করি না।"

রাসূল (সা.) শিশুদের সীমাহীন ভালোবাসতেন। দেখা হলেই তিনি আগে সালাম দিতেন। রাসূল (সা.)-এর অভ্যাস ছিল বাইরে থেকে সফর শেষে যখন বাড়ি ফিরতেন তখন শিশু কিশোরদের তাঁর সাওয়ারীর পিঠে তুলে নিয়ে তাদেরকে তাঁর আগে পিছে বসিয়ে বাড়ি ঢুকতেন। একবার দু'জন শিশু রাসূল (সা.)-এর উটের পিঠে উঠে বসেছে। একজন তাঁর সামনে একজন পেছনে। সামনের শিশুটি পেছনের জনকে বলছে "আমি নবীজি (সা.)-এর সামনে বসেছি, তুমি তো বসেছ পেছনে।"

পেছনের শিশুটি রাসূল (সা.) দু'হাতে আকড়ে ধরে বলল "আমি তো নবীজির গায়ের সাথে মিশে আছি।" সামনের শিশুটি রাসূল (সা.)-এর গায়ে হেলান দিয়ে বলল "আমি নবীজির বুকে হেলান দিয়ে বসেছি।"

পেছনের শিশুটি নবীজিকে জড়িয়ে ধরে বলল "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জড়িয়ে ধরে আছি।" সামনের শিশুটি আর বলার কিছু না পেয়ে চুপ করে থাকলো। তখন রাসূলুল্লাহ তার গায়ে হাত রাখলেন। শিশুটি তখন খুব খুশি হলো। শিশুদের নিয়ে এমনি অনেক ঘটনা আছে।

রাসূল (সা.) নামাজে সিজদায় গেলে হাসান হুসাইন জয়নাবের (রা.) মেয়ে ওমামা প্রায়ই তাঁর পিঠে ও ঘাড়ে উঠে বসে থাকত। তিনি তখন সিজদা দীর্ঘ

www.amarboi.org

করে নিতেন যাতে তাদের তাড়াতাড়ি নামতে না হয়। তিনি শিশুর বাবা মাকে সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান করতে বলেছেন। জনৈক ব্যক্তি তার দু'সন্তানের একজনকে চুমু দিল একজনকে দিল না। তা দেখে রাসূল (সা.) বললেন "দু'জনকেই চুমু দিলে না ক্যান? তাদের মধ্যে সমতা বিধান করলে না ক্যান?"

হযরত বাশীর (রা.) তার পুত্র নোমান ইবনে বাশীরকে একটি বাগান দান করেন এবং রাসূলকে বলেন "ইয়া রাসূল (সা.) আমি আমার এই পুত্রকে একটি বাগান দান করেছি।"

রাসূল (সা.) বলেন "তুমি তোমার সব সন্তানকেই অনুরূপ বাগান দান করেছ।"

বাশীর বলেন "না, তা করিনি।"

রাসূল (সা.) বলেন "তাহলে তোমার বাগান ফেরত নাও না হলে প্রত্যেককে একটি করে বাগান দাও। এর পর বাশীর আনসারী (রা.) তার দান ফেরত নিলেন।" (বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একদিন হযরত আয়েশার (রা.) ঘরে একজন মহিলা আসে। তার সাথে ছিল ছোট দু'টি মেয়ে। হযরত আয়েশার কাছে তখন একটি খেজুর ছাড়া কিছুই ছিল না। তিনি সেই একটি খেজুর-ই মহিলাকে দিলেন। মহিলা খেজুর টিকে দু'টুকরো করে মেয়ে দুটিকে দিল।

রাসূল (সা.) ঘরে ফিরলে হযরত আয়েশা এই ঘটনা তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন। মহানবী (সা.) বললেন, "যে নারী সন্তানের প্রতি মমতা পোষণ করে সে যদি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।"

এই মায়ের আচরণে সন্তানদের প্রতি সমতা বিধানের গুণটি ফুটে উঠেছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করো। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো।" (মুসনাদে আহমাদ)

রাসূল (সা.) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিশুর সাথে বিভিন্ন রকমের মধুর আচরণ করেছেন।

আমরা মাতা-পিতার অধিকার সংক্রান্ত অনেক কথা বলি কিন্তু সন্তানেরও যে অধিকার আছে সে কথা অনেকেই তা বেমালুম ভুলে যাই।

সন্তানের প্রথম অধিকার– ১. সৎ, শিক্ষিত, পরহেজগার মাতা পিতা পাওয়ার অধিকার। রাসূল (সা.) পুরুষদের বলেছেন "সাধারাণত চারটি কারণে কোনো মহিলাকে বিয়ে করা হয়ে থাকে ঃ ১. তার ধন সম্পদ থাকার কারণে,

www.amarboi.org

২. বংশ মর্যাদার কারণে

৩. রূপ সৌন্দর্যের কারণে এবং

৪. দীনদারীর কারণে। তবে তোমরা দীনদার মেয়েকেই বিয়ে করো। সুখ শান্তিতে থাকো।" (বুখারী-মুসলিম, মেশকাত)

মেয়েদের অভিভাবকদের প্রতিও একই প্রকার নির্দেশ দিয়ে রাসূল (সা.) বলেছেন "যদি তোমার কাছে এমন কোনো প্রস্তাব আসে যার (ধর্মপরায়ণতা) দীন ও চরিত্র তোমরা পছন্দ করো তবে তাকে জুড়ি হিসাবে গ্রহণ করো। যদি এমনটি না করো তবে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি হবে।"

এই প্রসঙ্গে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর খেলাফত আমলের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

একদিন একজন লোক হযরত ওমর (রা.) কাছে তার ছেলেকে নিয়ে হাজির হলো। বললো "হে আমীরুল মুমিনিন এ আমার সন্তান কিন্তু সে আমার কোনো হকই আদায় করে না।"

তখন ওমর (রা.) ছেলেটিকে বললেন "তুমি কি আল্লাহ কে ভয় করো না? পিতা মাতার হক আদায় না করা বড়ই গুনাহের কাজ তা কি তুমি জান না?"

ছেলেকে বলল "হে আমীরুল মুমিনিন। পিতা মাতার উপরও সন্তানের কোনো হক আছে কি?"

ওমর (রা.) বললেন "অবশ্যই– আর তা হচ্ছে–

১. পিতা নিজে সৎ ও ভদ্র মেয়ে বিয়ে করবে, যেন তার মা এমন কোনো নারী না হয় যার দরুন সন্তানের সামাজিক মর্যাদা নষ্ট না হয় বা লজ্জা ও অপমানের কারণ না হয়।

২. সন্তানের ভালো কোনো নাম রাখা

৩. সন্তানকে কিতাব ও দীন শিক্ষা দেয়া।

ছেলেটি বলল–

"আল্লাহর কসম! আমার পিতা এর একটা হকও আদায় করেনি। আমার মা একজন অগ্নী উপাসকের মেয়ে। আমার নাম ছারপোকা এবং আমাকে কিতাব ও দীনের কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয়নি।"

তখন ওমর (রা.) লোকটিকে বললেন "তুমি বলছ তোমার সন্তান তোমার হক আদায় করছে না। আসলে তো তুমিই তোমার সন্তানের হক আদায় করোনি।"

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে

www.amarboi.org

১. সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকার : পিতামাতা কোনো অবস্থাতেই সন্তান হত্যা করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করোনা। তাদের রিজিক আমিই দেবো এবং তোমাদের রিযিকও। মনে রাখো সন্তান হত্যাকরা জঘন্য অপরাধ। (সূরা বনী ইসরাইল-৩১)

আবার বলেছেন, "আর (নারীরা যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে) তারা তাদের সন্তান হত্যা করবে না তবে আপনি তাদের বায়য়াত গ্রহণ করুন। (সূরা মুমতাহিনা-২২)

তার মানে আল্লাহ সন্তান হত্যা একদম হারাম করে দিয়েছেন অকারণে জন্ম নিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত, হত্যা যেভাবেই করা হোক না কেন তা আল্লাহর নিকট জঘন্য অপরাধ, মহাপাপ।

২. কানে আজান দেওয়া : সন্তান জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে কানে আজান দেওয়া রাসূল (সা.)-এর সুন্নত।

আবু রাফে (রা.) বর্ণনা করেছেন "ফাতিহা হুসাইনকে প্রসব করার পর আমি রাসূল (সা.)-কে তার কানে আজান দিতে দেখেছি।" (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

৩. আকীকা করা ও নাম রাখা : আকীকা এবং সুন্দর একটা নাম পাওয়া শিশুর অধিকার। এই প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন "প্রত্যেক নবজাতক আকীকার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে প্রাণী জবেহ করবে। তার নাম রাখবে এবং মাথা মুণ্ডন করবে। (তিরমিযী) উল্লেখ্য যে, ভাল এবং শ্রুতি মধুর একটা নাম পাওয়া সন্তানের জন্মগত অধিকার।

৪. লালন পালনের অধিকার : সন্তানের লালন পালন পিতা মাতার বিশেষ দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (মিশকাত) অর্থাৎ সন্তানকে উত্তমরূপে লালন পালন করা বাবা মায়ের দায়িত্ব।

রাসূল (সা.) বিভিন্ন কথা উপদেশ এবং আচরণের মাধ্যমে জনগণকে এই সব দায়িত্ব পালন করতে শিখিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা বলেন "যারা নিজেদের সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাবশত হত্যা করেছে নিঃসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।" (সূরা আনয়াম : ১৪০)

আবার বলেছেন "দারিদ্র্যের ভয়ে নিজেদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকে রিযিক দেই তাদের ও রিজিক দেই। (সূরা আনয়াম : ১৪০)

শিশু যাতে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারে,আদর্শ মানুষরূপে গড়ে উঠতে

www.amarboi.org

পারে এই জন্য রাসূল (সা.) শিশুদের ভালোবাসা পাবার অধিকার নিশ্চিত করেছেন। রাসূল (সা.) শিশুদের খুবই ভালোবাসতেন। শিশুদের ভালোবাসার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে রাসূল (সা.)-এর জীবনে। শিশুরা তাঁর কাছে আসলে তিনি কোলে তুলে নিতেন। চুমু দিতেন, অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। শিশুদের আগে সালাম দিতেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন।

আর এই শিশু কিশোররাও রাসূল (সা.)-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে মক্কী জীবনের ভয়ঙ্কর বৈরী পরিবেশেও শিশু কিশোররাও ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যেমন– হযরত আলী (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে হারেসা, আম্মার ইবনে ইয়াসারসহ আরো অনেকে। মদীনার দুই কিশোর যখন জানতে পারলেন আবু জাহেল রাসূল (সা.)-কে খুব কষ্ট দিয়েছে তখন তারা আবু জাহেলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বলেন "বদর যুদ্ধের সময় আমার দুই পাশে দুইজন কিশোরকে দেখতে পেলাম। তাদের একজন অতি সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল। আবু জাহেল লোকটি কে? আমাকে একটু দেখিয়ে দিন। আমি বললাম, তার পরিচয় কেন জানতে চাও? কিশোরটি বলল আমি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তাকে যেখানেই দেখবো সেখানেই হত্যা করব, নয়ত শহীদ হবো। আমি উত্তর দিতে না দিতেই অপর কিশোরটি ও আমাকে ঐ কথাই জিজ্ঞেস করল।

আমি ইঙ্গিতে আবু জাহেলকে দেখিয়ে দিলাম, তারা বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গিয়ে আবু জাহেলকে আক্রমণ করল। তাদের তরবারির আঘাতে আবু জাহেল মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। পিতার এই অবস্থা দেখে আবু জাহেলের পুত্র ইকরামা এক কিশোরের বাহুতে আঘাত করল, বাহুটি প্রায় ছিন্ন হয়ে ঝুলতে লাগলো। কিশোর দেখলেন তাঁর ছিন্ন প্রায় বাহুটিতে বেশ সমস্যা হচ্ছে তখন তিনি তার বাহুটি পায়ের তলায় চেপে ধরে এক টানে ছিঁড়ে ফেললেন। এই কিশোরদ্বয় আফরার দুই পুত্র– মুয়ায এবং মায়ায।" (সহী বুখারী : ১ম খণ্ড)

শুধু রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসাই কিশোরদ্বয়কে এত দুঃসাহসী করে তুলেছিল। আর এক কিশোর যায়েদ ইবনে হারেসা। হযরত খাদিজা (রা.) যখন ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারেসাকে রাসূল (সা.)-এর খিদমতের জন্য উপহার দিয়েছিলেন তখন যায়েদের বয়স পনের বছর।

যায়েদের বাবা এবং চাচা অনেক খোঁজ করতে করতে সুদূর ইয়েমেন থেকে মক্কায়

www.amarboi.org

এসেছিলেন হারানো যায়েদের জন্য। অর্থের বিনিময় হলে ও যায়েদ কে চাই: বলে তারা রাসূল (সা.)-এর কাছে আবেদন জানাল।

তখন রাসূল (সা.) ঘোষণা করলেন "আমি যায়েদকে স্বাধীন করে দিয়েছি, যদি সে আপনাদের সাথে যেতে চায় কোনো রকম প্রতিদান ছাড়াই তাকে মুক্ত করে দেবো আর সে যদি আমার সাথে থাকতে চায়। আমি তাকে বিদায় করবো না।" যায়েদ তখন স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন আব্বা ও চাচার সাথে যাওয়ার চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে থাকা তাঁর পছন্দ। যায়েদকে তার বাবা ও চাচা তার মায়ের স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছিল। যায়েদ তার উত্তরে বলেছিল– "মাকে বলবেন, আমি ভাল আছি। যে সোনার মানুষ পেয়েছি তাঁকে ছেড়ে আমি যেতে পারি না।"

মদীনার আর এক শিশু আনাস ইবনে মালেক। দশ বছর বয়সে তাকে তার মা উম্মে সুলাইম রাসূল (সা.)-এর খেদমতে পেশ করেন।

রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি বলেন "আমি দশ বছর রাসূল (সা.)-এর সাথে কাটিয়েছি এই দশ বছরে তিনি একটি বারও বলেননি তুমি এমনটি কেন করলে না?"

শিশুদের প্রহার করা তো দূরের কথা শিশুদের তিনি কোনো দিন ধমক পর্যন্ত দেননি।

সুশিক্ষা পাবার অধিকার

রাসূল (সা.) বলেন "তোমাদের কারো আপন সন্তানকে শিক্ষা দান করা প্রতিদিন যথেচ্ছা পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী সদকা করার চেয়ে উত্তম। (তিরমিযি)

আসুন সবাই শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সতর্ক হই। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন...।

উত্তাল মহাসমুদ্রে দিকভ্রান্ত নাবিকদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য যেন থাকে বাতিঘর; তেমনি দুনিয়া ও আখেরাতে ঘোর আঁধারে ইবলিসের দেখানো হাজারো ভ্রান্ত মত ও পথের মধ্যে রাসূল (সা.)-এর দেখানো পথই একমাত্র সঠিক পথ। তিনিই একমাত্র বাতিঘর। স্বস্তির বাতিঘর।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

লেখকের কয়েকটি বই

- নামায জান্নাতের চাবী
- নিশ্চয় প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানীও রয়েছে
- শাফায়েত মিলবে কি?
- নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক
- আমার সিয়াম কবুল হবে কি?
- নামের মাঝে লুকিয়ে আছে আমার পরিচয়
- বিশ্ব ভালবাসা কি দিবস নির্ভর?
- স্বস্থির বাতিঘর

আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ▮ বাংলাবাজার ▮ কাঁটাবন
E-mail: ahsan_publication@yahoo.com